স্মৃতির শহর

একটি *সচলায়তন* প্রকাশনা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই প্রকাশনার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ আন্তর্জাল বা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রকাশ করার আগের লেখকের অনুমতির প্রয়োজন হবে। এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা আন্তরিকভাবে কাম্য।

স্মৃতির শহর

স্মৃতির শহর

তাসনীম হোসেন

প্রকাশক: সচলায়তন ডট কম
সম্পাদনা পরিষদ: শাহরিয়ার মামুন, তৃষিয়া নাশতারান, তিথীডোর, রাফি
স্বত্ব: আনুশা হোসেন ও সামারা হোসেন
প্রকাশ: মে ২০১১
প্রচ্ছদ: মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
অলংকরণ: তিথীডোর
ছবি: তানজীর ওয়াহাব [১], আন্তর্জাল [১], [২]

আমার কৈফিয়ত

স্মৃতির শহর আমার শৈশবের গল্প। কিন্তু এই গল্পগুলো আমার মাথায় অনেকদিন ধরেই ঘুরছিল। সচলায়তন ও অভ্রের কল্যাণে সেগুলো বলার সুযোগ পেয়েছি। এই সিরিজটা প্রায় দশ মাস ধরে সচলায়তনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, যদিও কাহিনিগুলো বেশ ছন্নছাড়া, ঠিক স্মৃতি যেমনটা হয়।

সিরিজটা নিয়ে আমি শুরুতে বেশ দ্বিধান্বিত ছিলাম। আমি বিখ্যাত কেউ না, আমার শৈশব নিয়ে কারো আগ্রহ থাকার কথা না। ক্রমাগত স্মৃতিচারণ মানুষের বিরক্তি উৎপাদনের কারণও হতে পারে। অনেক ইতস্তত বোধ নিয়ে আমি প্রথম পর্বটা সচলায়তনে প্রকাশ করি ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। কিন্তু দেখা গেল পাঠককুল অসন্তুষ্ট নন আমার এই স্বগত সংলাপের মতো স্মৃতিভাষণে।

সিরিজটা চলতে চলতে আমার বিরাট একটা উপলব্ধি হয়েছে। শৈশবের আনন্দমেলাতে সবারই কেমন একটা ঐক্য আছে, কোনোকিছু না মিললেও অনেক কিছুই আবার মিলে যায়। আমাদের ব্যস্ত দিনের মাঝে শৈশব যেন এক চিলতে রোদ্দুর, অনেক দূর থেকেও আমাদেরকে সে অপার শান্তি আর আশ্রয় জুগিয়ে চলে। সেই বিচারে ফেলে আসা নরম আর কোমল শৈশবের শক্তিও কম নয়। এই কারণেই স্মৃতির শহর শুধু আমার একার নয়, এটা আমাদের সবার শহর। আমরা হুটহাট এতে আসা-যাওয়া করি, এর স্বাদ আর গন্ধ বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। ক্রমেই আমি বুঝতে পারলাম, আমাদের শৈশবের গল্পগুলোর অংশীদার আমরা সবাই।

লেখক হওয়ার ইচ্ছে, যোগ্যতা বা বাসনা আমার কস্মিনকালেও ছিল না। এই সিরিজকে অনেকেই বই হিসেবে বের করতে বলেছেন। বই মানেই কেনাবেচার হিসেব। স্মৃতির শহরকে নিয়ে এই বাণিজ্যে আমি যেতে চাই না। এটা ফ্রিওয়্যারই থাকুক। সেই বিচারে ই-বুকই সর্বোত্তম পন্থা। এই ই-বুকের উদ্যোক্তাও আমি নই, আপনাদের স্মৃতির শহরের প্রতি ভালোবাসাই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে এই প্রকাশনায়।

বানান নিয়ে সমস্যা সবসময়ই ছিল। সিরিজ চলাকালীন সময়ে সচলায়তনের ব্লগার তিথীডোর ও তৃষিয়া আমাকে বানান সংশোধনীতে প্রচুর সাহায্য করেছে। ই- বুক তৈরির সময়ে সর্বাত্মক সাহায্য পেয়েছি শাহরিয়ার, তৃষিয়া, তিথীডোর, আর রাফির কাছ থেকে। স্মৃতির শহরে এঁদের অবদানের জন্য আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

স্মৃতির শহরের প্রচ্ছদের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমানকে। অত্যন্ত অল্প সময়ে উনি এই চমৎকার প্রচ্ছদটি করে দিয়েছেন। সহসচল তানজীর ওয়াহাবের তোলা একটি ছবি দেখে হঠাৎ করেই বালকবেলা ফিরে এসেছিল আমার কাছে। সেই ছবিটিও এই বইতে ব্যবহার করা হয়েছে। আমাকে উজানে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ তানজীরকেও।

স্মৃতির শহরের পাঠককুলকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই আশ্চর্য যাত্রায় আমার সাথে থাকার জন্য। এই সিরিজ শেষ হয়ে গেলেও শৈশবকে বাদ দিয়ে লিখতে পারব না। সচলায়তন আর অভ্রের টিমকেও ধন্যবাদ। অভ্রের স্লোগান - *ভাষা হোক উন্মুক্ত* - আমার জন্য প্রযোজ্য হয়েছে। একদিন সবার জন্যই হবে সুনিশ্চিত।

সবাইকে আবারো শুভেচ্ছা।

তাসনীম হোসেন
অস্টিন, টেক্সাস
মে ০৯, ২০১১

উৎসর্গ

আমার দুই কন্যা আনুশা ও সামারা
এবং
আমার সহধর্মিনী মারিয়া রহমানকে

সূচিপত্র

জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি	১
ইচ্ছে হয় কান পেতে থাকি	৫
উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ	৯
২৯ নম্বর বাড়ি	১৪
ইশকুল	১৮
তিনি বৃদ্ধ হলেন	২২
হাবিবিয়া লাইব্রেরি	২৫
জাতিস্মর	২৯
কবি	৩৩
আশ্চর্য ভ্রমণ	৩৮
পরিসীমা	৪১
দুই পৃথিবী	৪৭
সেইসব রোদ্দুর	৫১
বালকবেলা	৫৭
দুপুরবেলার গল্প	৬১
বড় হওয়ার গল্প	৬৫

“

মনুষ্যজন্ম বড় যাতনার মা!
পাখি কিংবা গাছেদের সমাজে স্মৃতিদণ্ড নেই,
কিন্তু মানুষ?
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে ফের এসে ঘর বাঁধে স্মৃতিশ্বরী নদীপাড়েই!

মা সমীপেষু; সুমন সুপান্থ

”

স্মৃতির শহর - ১:
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি

পাখির ডানার শব্দে সচকিত
সকালবেলার মতো আমার শৈশব
প্রত্যাবর্তনের দিকে ফেরাবে না মুখ
কস্মিনকালেও।

(*দশটাকার নোট এবং শৈশব;* শামসুর রাহমান)

আমাকে যদি টাইম মেশিন দিত কেউ, তাহলে আমি ঠিক ঠিক চলে যেতাম শৈশবে, যেখানে এখনো একজন আইসক্রিমওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সেই কপাল কি আমার আছে! যদিও ঘুমে- জাগরণে আমার সব ভ্রমণ শৈশব- অভিমুখে। এই সিরিজটা আমার শৈশব নিয়ে। আমার স্মৃতিকাহিনি পড়ে কার কী লাভ হবে, বলতে পারছি না। তবে শৈশব এবং কৈশোরকে ধরতে পারার মাঝে এক ধরনের ব্যক্তিগত সুখ আছে। যতই দূরে যাই ছেলেবেলা থেকে, ততই যেন মন ছুঁতে চায় তাকে। স্মৃতিপীড়ায় আনন্দ আছে বেশ। যদি সেই আনন্দের কিছুটাও আপনাদের দিতে পারি, তবেই আমি খুশি।

স্বাধীনতার আগে আমার জন্ম। সুতরাং আমার জীবনের প্রথম কিছু অংশ আমি নিশ্চয়ই পাকিস্তানি (এখন বলি পাক্কু) ছিলাম। একটু বড় হওয়ার পর এটা নিয়ে আমার কিছুটা ক্ষোভ ছিল, আরেকটু পরে জন্মালেই তো আমি বাংলাদেশি হয়ে জন্মাতে পারতাম!

আমার জীবনের প্রথম কয়েক বছর কেটেছে ধানমন্ডির এডুকেশন সেন্টারের (বর্তমানে ''নায়েম'' নামে পরিচিত) কলোনিতে। জায়গাটা বিশাল, পেছনে বিডিআর, সামনে গভ: ল্যাবরেটরি স্কুল এবং ঢাকা কলেজ। শহরের ঠিক মাঝখানে হলেও জায়গাটাতে একটা মফস্বল মফস্বল গন্ধ ছিল। আমরা ''সেন্টার'' বলতাম জায়গাটাকে। এখনো পুরোনো লোকজন মাঝে মাঝে সেন্টার বলে ফেলে, যদিও নাম বদলে গেছে বহু বছর আগেই।

১৯৭১- এ জায়গাটা ছিল পাকিস্তান আর্মির সুরক্ষিত এলাকা। অনেকে পালালেও আমাদের সেই উপায় ছিল না, তাই অবরুদ্ধ জীবনযাপন চলত আমাদের পরিবারের। যুদ্ধের শেষদিকে শুরু হয় ভারতীয় বাহিনীর এয়ার রেইড, অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিল বিডিআর, যার অবস্থান আমাদের বাসার ঠিক পেছনে। সুতরাং যেকোনো মুহূর্তে লক্ষ্যভ্রষ্ট বোমার আঘাতের ভয়। আম্মাকে পরে জিজ্ঞেস করেছিলাম কতখানি ভয়ে ছিলেন তাঁরা। উত্তর ছিল, প্রথমে ভয় থাকলেও তা পরে কেটে যায়, রাতে মুক্তিবাহিনীর হামলা আর ভারতীয় বোমার আওয়াজ বেশ মধুরই নাকি লাগত।

আমার তিন বছর বয়সে আমার পরিবার সেন্টার ছেড়ে তেজগাঁয়ে আমাদের নিজেদের বাসায় এসে ওঠে। এর প্রায় আরও তিন বছর পরে আমি গভ: ল্যাবরেটরি স্কুলে ভর্তি হই এবং সেখান থেকে ঢাকা কলেজ, সুতরাং সেন্টার ছেড়ে গেলেও ওই এলাকায় আমার আরও বারো বছর যাতায়াত ছিল। আমার শৈশব এবং কৈশোরের অনেকখানি জুড়েই আছে তেজগাঁ আর ঢাকা কলেজ এলাকার স্মৃতি।

স্মৃতির রঙিন কাচের ভেতর দিয়ে তাকালে সবকিছুই মনোরম লাগে। আমার কথা না, বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন পুরানা পল্টন নিয়ে। সুতরাং শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের ঢাকা যে বর্ণিল লাগবে, তা আর আশ্চর্য কী! কিন্তু এটাও সত্য যে ঢাকা শহরটা তখনো এরকম অচেনা হয়ে যায় নি। আজকের ঢাকাকে দেখলে মনে হয় শহরটা ধুঁকছে, কিন্তু সত্তর এবং আশির দশকের ঢাকা মনে হয় আসলেই তিলোত্তমা ছিল, আজকের এই আধপোড়া শহরটার তুলনায়।

আমার শৈশবের প্রথম স্মৃতি হলো আমার মা। আম্মা যেন কাকে বলছিলেন আমার সম্বন্ধে, ''ওর বয়স তো তিন পুরলো।'' সময় হিসেব করে দেখলে সালটা হবে ১৯৭৩- এর শেষদিক। দেশের অবস্থা তখন বেগতিক, দুর্ভিক্ষ শুরু হয় হয়, রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগ সরকার বেশ বিপর্যস্ত। আমার অবশ্য তখন কোনোকিছুই বোঝার কথা নয়। কিন্তু গাড়ি থামিয়ে রক্ষীবাহিনীর তল্লাশি,

তেজগাঁ স্টেশন (আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র ১০০ গজ দূরে) থেকে সারি সারি দুর্ভিক্ষ- আক্রান্ত মানুষের মিছিল (ভাত বড় দুর্লভ তখন, তারা একটু ভাতের ফেন পেলেই খুশি), এসব এখনো একটু একটু মনে পড়ে যায়। কার্যকর কোনো বিরোধী দল না থাকায় জাসদ তখন ওই ভূমিকায়, মুজিব আমলের শেষদিকে বুয়েটের কোনো একজন জুনিয়র শিক্ষক (নিখিল?) বোমা বানাতে গিয়ে মারা পড়েন, এটাও ঝাপসা মনে আছে।

ছাড়াছাড়াভাবে চলচ্চিত্রের মতো পনেরোই আগস্টের ঘটনা মনে আছে, বাসার সবার হাবভাব থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে সাংঘাতিক কিছু হয়েছে। আমি স্কুলে ভর্তির কয়েক মাস আগে জিয়াউর রহমান জাসদ- সমর্থিত সিপাহী জনতার বিপ্লবে ক্ষমতায় এসেছেন, এবং কয়েদ করেছেন সততবিপ্লবী কর্নেল তাহেরকে। এগুলো সবই পড়া ইতিহাস, কিন্তু মাঝে মাঝে স্মৃতিতে "SNEAK PREVIEW"- এর মতো কিছু কিছু ছবি দেখি।

তবে এটা বেশ মনে আছে, জিয়া আসার পর দেশের আইন- শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বেশ উন্নতি হয়, আওয়ামী লীগকে মোকাবিলা করতে জিয়া আস্তাকুঁড় থেকে উঠিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন চিহ্নিত রাজাকারদের। পরবর্তীতে সংবিধানের মুসলমানি করিয়ে যে মৌলবাদের উত্থান হলো, তা থেকে আজও নিস্তার মেলে নি আমাদের। বঙ্গবন্ধু যদি কঠিন হাতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতেন এবং নিজ দলের লুটেরা চাটুকারদের নিয়ন্ত্রণ করতেন, তবে বোধ হয় অন্যরকম হতো আজকের বাংলাদেশ, হয়ত ভারতের সাথে পাল্লা দিতাম আমরা প্রযুক্তিতে। ১৯৭১- এর পর আমরা সামনে হাঁটি নি বেশি, আমাদের হণ্টন বোধ হয় বেশি হয়েছে পশ্চাতে।

১৯৭৭- এর অক্টোবরে জাপান এয়ারলাইন্সের একটা বিমান ছিনতাই করে জাপানি রেড আর্মি। বিমানটা পুরাতন এয়ারপোর্টের পাশে লালদিঘির মাঠ বলে একটা জায়গায় রাখা ছিল। আমাদের বাসা থেকে হাঁটা দূরত্বে জায়গাটা। আমরা সদলবলে গিয়ে দেখে এলাম দূর থেকে, ফার্মগেটের ওভারব্রিজ থেকেও প্লেনটার লেজ দেখা যেত। আমরা সবাই উত্তেজিত। বিটিভি ছিনতাইয়ের ঘটনা "লাইভ" কাভার করছিল, সম্ভবত সেটাই বিটিভির প্রথম লাইভ কাভারেজ। স্ক্রিনের কোনায় লেখা "লাইভ"। আমাদের ভাড়াটিয়া মতিউর চাচা বোঝালেন "লাইভ" মানে বিমানের সব যাত্রী জীবিত আছেন। জিয়াকে অনেকগুলো ক্যু মোকাবিলা করতে হয়, এই সময়েও একটা ক্যু হয় যার কিছুটা মনে হয় টিভিতে দেখা গেছে। পরে জেনেছি জিয়াউর রহমান নির্দয়ভাবে মানুষ মেরেছেন সেই

ঘটনার পরে, এবং আরও অনেক অনেক সৈনিক, পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ক্যুতে। নিয়তির অনিবার্য পরিণতি বোধ হয় তাই লেখা ছিল তার নিজের ললাটেও। শৈশবের প্রথম স্মৃতির বাংলাদেশকে চিন্তা করে দেখলে বিক্ষুব্ধ প্রামাণ্যচিত্র মনে হয়।

তবে আমি মোটেও চিন্তিত ছিলাম না উদ্ভট উটের পিঠে চড়ে বসা স্বদেশ নিয়ে। স্কুল কামাই ছিল নিয়মিত। বাবা- মা কাজে গেলে আমি ঘুরে বেড়াতাম আপন মনে। আমাদের বাসাটাও মফস্বল শহরের বাসার মতো, তেজগাঁ পুরো শহর হয় নি তখনো। আমাদের বাসায় অনেকগুলো নারিকেল গাছ, আম, লিচু, পেয়ারা, জাম্বুরা, জামরুল (যাকে আব্বা বলতেন মণ্ডাফল), পাশের বাসার কামরাঙা গাছের প্রায় পুরোটাই আমাদের বাসায় পড়েছে, যাতে প্রতিদিন টিয়াপাখি আর নানা রঙের প্রজাপতি আসে। আমার দুপুরগুলো কাটত তাদের সাথে। বাসার খুব কাছে বিশাল এক জাম গাছ, যেখানে ভূত না থেকে যায় না! বাসার পাশেই টেকনিক্যাল কলেজের (পরে নাম হয় বিজ্ঞান কলেজ) পুকুর আর একটু দূরে খ্রিষ্টানদের কবরস্থান। সন্ধ্যার পর গা একটু ছমছম করত। আমি গন্তব্যহীনভাবে হেঁটে বেড়াতাম সারাদিন পাড়াময়।

আমি মনে হয় আজও ঘুরে বেড়াচ্ছি গন্তব্যহীন... সফর শেষ করে মন ফিরতে চায় সেই স্বপ্নঘেরা সবুজ শহরে, যদিও আজকের ঢাকা থেকে আম, জাম, লিচু, নারিকেল, টিয়া, প্রজাপতি, পুকুর, ভূতপ্রেত সবাই বিতাড়িত হয়েছে। আমিও কি নির্বাসিত নই ওদের মতোই?

স্মৃতির শহর - ২:

ইচ্ছে হয় কান পেতে থাকি

অকস্মাৎ দুপুরে চিলের ডাকে আমার শৈশব ফিরে আসে
শ্লেট, চকখড়ি আর বাদামি রঙের
ব্যাগ হাতে। গলিতে আবছা কণ্ঠস্বর। আরও কিছু
প্রিয় স্মৃতি আলোড়নকারী শব্দ শোনার আশায়
ইচ্ছে হয় কান পেতে থাকি।

(*ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই;* শামসুর রাহমান)

ঝকঝকে একটা দিন, জ্বালা ধরানো নয় বরং বেশ শান্ত ও সুশীল গোছের রোদ উঠেছে। উত্তাপহীন রৌদ্রোজ্জ্বল এই দিনে আকাশটাও বেশ ঘন নীল, খুঁজলে কিছু সাদা মেঘও পাওয়া যাবে। এই রকম দিন আপনি বাস্তবে বেশি না পেলেও স্মৃতির শহরের দিনগুলো হরহামেশাই এই ধরনের হয়। আমি মাঝেমাঝে এখনো দেখতে পাই এই রকম একটা দিনে আমাদের বাসার ছাদে দাঁড়িয়ে আমি আর তিথি মুগ্ধ চোখে রেলগাড়ি দেখছি। আর একটু দূরে তাকালেই তেজগাঁ শিল্প এলাকার বিষণ্ন চিমনিগুলো দেখা যাবে, যেখান থেকে সাদা বা কালো ধোঁয়া বের হয় দিনরাত। আমরা দুজনেই একমত যে এই ধোঁয়াগুলোই আকাশে গিয়ে মেঘ হয়ে যায়, তাই মেঘগুলো সাদা আর কালো।

আমার খুবই পছন্দের বাহন এই রেলগাড়ি। যদি সম্ভব হতো, তবে আমার সব চলাফেরা হতো রেলগাড়িতেই। মানুষ খুব বড়লোক হয়ে গেলে শুনেছি প্লেন কেনে, আমার যদি অনেক টাকা হয় কোনোদিন, তবে আমি কিন্তু প্লেন কিনব না, বরং আমার একটা ট্রেন কেনার ইচ্ছে আছে। আমার বাবারও রেলগাড়ি খুব পছন্দের জিনিস ছিল এবং এই একটি কারণেই নিজের বাসা তিনি এমন জায়গায় বানিয়েছেন যেন ঘর থেকে রেলগাড়ি দেখা যায়। এখনো গভীর রাতে ঘুম ভেঙে দূরে রেলগাড়ির শব্দ শুনলে ছেলেবেলার সেই রেলগাড়ির কথা মনে পড়ে... আধো ঘুম আধো জাগরণে মনে হয় দূর থেকে নয়, যেন অতীত থেকেই আসছে সে শব্দ। ফ্রান্সে মধুসূদনের হোমসিকনেসের ব্যাপারটা আজকাল ভালোই বুঝি।

তিথিকে চিনলেন না তো? ওরা আমাদের বাসায় ভাড়া থাকত। আমাদের বাসাটা তখনো পুরো দোতলা হয় নি, বলা যায় পৌনে দোতলা। আমাদের একতলায় থাকে তিথিরা। আমি আর তিথি প্রায় সমবয়সি। ওদের অনেকগুলো ভাইবোন; লিথি, যূথি, সাথী। আমরা কেউ তখন স্কুলে যাই না। তিথির সাথে আমি খেলি, যদিও ওরা দলে ভারী দেখে আমার বেশি পাত্তা মেলে না। হাঁড়িপাতিল খেলাতে আমি প্রায়ই চাকরবাকরের ভূমিকা পাই। খুশিমনেই সেটা মেনে নেই। যেটা পাওয়া যায় সেটাতেই আমি খুশি। পরবর্তী জীবনে দেখেছি, চাওয়া কম থাকলেই জীবনে যা পাওয়া যায়, তাই নিয়ে খুশি হওয়া যায়।

যাহোক তিথি আমার জীবনের প্রথম বন্ধু। মেয়েবন্ধু দিয়েই জীবন শুরু, কয়জনার থাকে এই ভাগ্য? আমার সাথে অনেক ভাব ছিল তার। সুতরাং ওরা যখন আমাদের বাসা ছেড়ে দেওয়ার কথা বলল, আমি বেশ মুষড়ে পড়লাম। সত্যি সত্যি একদিন তিথিরা আমাদের বাসা ছেড়ে কাছেই আরেকটা বাসায় চলে যায়। তিথিরা চলে যাওয়ার পরপর আমি কঠিন জ্বরে পড়ি। এখন আমার ধারণা এটা হয়েছিল সেপারেশন অ্যাংজাইটি থেকে। আমার বয়স তখন পাঁচটাচ হবে হয়ত। কাছেই থাকত ওরা, আমার বিরহজ্বরের কথা শুনে সপরিবারে আমাকে দেখতে আসে, নিমন্ত্রণ দেয় ওদের বাসায় বেড়াতে যাওয়ার। আমি সুস্থ হওয়ার কয়েকদিন পর ওদের বাসায় বেড়াতে গিয়ে দেখি তিথি নতুন বন্ধু নিয়ে মশগুল, আমাকে পাত্তাও দিলো না! বেশ দুঃখ নিয়ে আমি বাসায় ফিরি, আমার রেকর্ডবুকে সেটাই প্রথম মেয়েদের কাছ থেকে পাওয়া বড়সড় আঘাত। সেই শেষ, আর তিথির সাথে দেখা হয় নি কখনো, যদিও ওরা কাছেই থাকত এবং আমার বাবার সাথে ওর বাবার অনেকদিন যোগাযোগ ছিল।

আমার একটা জন্মত্রুটি ছিল যেটা ঠিক করতে আমার জন্মের পরপর দুইটা অপারেশন হয়। ছয় বছর বয়সে আবার তৃতীয় অপারেশন হয়, যেগুলোর ধাক্কায় আমার ছেলেবেলাটা একটু অন্যরকম হয়েছে। আমি একটু রোগাসোগা ছিলাম, হাঁটতেও পারতাম না ঠিকমতো। আব্বা আমাকে প্রচুর পায়ের ব্যায়াম করাতেন, আমি বয়সকালে তার সুফল পেয়েছি অনেক। তবে রোগাপটকা এবং কিছুটা প্রতিবন্ধকতার কারণে স্কুলে বা বাসায় শাসন একটু কমই ছিল। আমার মা-বাবা দুজনেই চাকরি করতেন, আমি থাকতাম আমার মতো। স্কুলে গেলেও কেউ কিছু বলে না, না গেলেও অসুবিধা নেই। স্কুল কামাইয়ের অভ্যেস আমার জীবনেও যায় নি, স্কুলের পর কলেজ, তারপর বুয়েট, সবকিছু কামাইয়ের রেকর্ড আছে আমার। মাঝে মাঝে মন চায় অফিস ফেলে পালিয়ে যেতে।

প্রায় একই সময় সাত সমুদ্দুর তেরো নদী ওপারের দেশ আমেরিকাতে একই সমস্যা নিয়ে আরেকটা মেয়ে জন্ম নেয়। মিয়্যা হ্যাম নামের সেই ছোটখাটো মেয়েটা সেই সমস্যা অতিক্রম করে বিশ্বজয় করে ফেলেছে ফুটবল খেলে, আর সময়মতো বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা আর ব্যায়ামের জোরে তৃতীয় বিশ্বের আমিও সম্পূর্ণ একটা স্বাভাবিক জীবন পেয়েছি। ঘটনাক্রমে মিয়্যা হ্যাম আর আমি আজকে একই শহরে থাকি। সেই ছোটবেলায় আরও দুয়েকজনের কথা শুনেছি যারা ছোট বাচ্চার অপারেশন করাতে হবে বলে বাচ্চার চিকিৎসা করান নি, আর এভাবে মোটামুটি প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ জীবন উপহার দিলেন সন্তানকে!

আমার হাঁটাচলায় অসুবিধা থাকলেও আমি চঞ্চল ছিলাম। একদিন আমি বাসা থেকে হারিয়ে যাই। খুব বেশি দূরে যাই নি। তখন বাসার দোতলার কাজ চলছে, আমি মিস্ত্রিদের ভারা বেয়ে ছাদে উঠে গেলাম এক ছুটির সকালে। নামার আর সাহস নেই, সেদিন বোধ হয় কাজ বন্ধই ছিল। অনেকক্ষণ পরে আমাকে ছাদ থেকে উদ্ধার করা হয় ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায়। আমি কেন চেঁচাই নি, সেটা এখনো একটা বিস্ময়।

সামান্য প্রতিবন্ধকতা নিয়েও স্কুলে ভর্তি হলে বেশ সমস্যায় পড়তে হয় বাচ্চাদের। সেই তুলনায় আমার সমস্যা কমই হয়েছে। স্কুলে স্যারেরা একটু প্রশ্রয় দিতেন, তুলনামূলকভাবে অন্য বাচ্চারাও "হার্ড টাইম" দিত না আমার হাঁটাচলার সমস্যা নিয়ে। আমার বাবার অফিসের পিয়ন রশিদ ভাই আমাকে স্কুলে আনানেওয়া করতেন, উনিও নজর রাখতেন আমার দিকে। রশিদ ভাইয়ের সাথে রিকশা করে স্কুলে যাওয়া আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় ভ্রমণকাহিনি। তেজঁগা থেকে ল্যাবরেটরি স্কুল অনেকটা পথ, রিকশায় প্রায় ২৫/ ৩০ মিনিট লাগত। একেকদিন একেক পথ দিয়ে রিকশা যেত। কোনোদিন ফার্মগেট হয়ে গ্রীন রোড দিয়ে অথবা কোনোদিন

হাতিরপুল হয়ে এলিফ্যান্ট রোড দিয়ে অথবা কোনো কোনো দিন বোকা রিকশাওয়ালা শাহবাগ হয়ে ঘুরে যেত। তীরের গতিতে রিকশা ছুটছে আর রশিদ ভাই আমাকে শক্ত করে হাত দিয়ে ধরে রেখেছেন... বিস্ময় নিয়ে আমি দেখছি শৈশবের ঢাকা। প্রাণশক্তিতে পূর্ণ মায়াময় এক সুপ্রাচীন কিন্তু যুবক শহর, অনেক বড় বড় কৃষ্ণচূড়া গাছ রাস্তার আইল্যান্ডে, মানুষের কোলাহল চারদিকে, তার মাঝে মাঝে রিকশার টুংটাং ঘণ্টি, ঝলমল করছে চারদিক... কী ইন্দ্রজালে ঢাকা শহর আজও আমার স্মৃতিতে রয়ে গেল অমলিন, শৈশবের ফেলে আসা শব্দে আর গন্ধে। সেই থেকে রেলগাড়ির মতো রিকশাও আমার দারুণ প্রিয় একটা বাহন। ঢাকায় কোনোদিন ফেরা হলে আমি একটা প্রাইভেট রিকশা কিনব।

হাতিরপুলের রাস্তায় খুব সরু একটা কালভার্ট ছিল, যার তলায় একটা খাল (ড্রেনের বিকল্প বোধ হয়), রিকশাওয়ালা রিকশা থেকে নেমে খুব আস্তে আস্তে জায়গা পার করত... আমি আতঙ্কে কাঠ হয়ে রশিদ ভাইকে ধরে আছি, এখনো স্পষ্ট মনে আছে। ভয়ে কাতর সেই শৈশবের আমাকে জড়িয়ে রশিদ ভাই আস্তে আস্তে বলছেন... “ভয়ের কিছু নেই ভাইয়া”... আজ এতগুলো বছর পর একা একা পথ চলতে মনে হয় এখনো একটা রশিদ ভাই থাকলে বেশ হতো, ভয় পেলে আমার হাতটা ধরে বলত... “ভয়ের কিছু নেই ভাইয়া”...

স্মৃতির শহর - ৩:
উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ

উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ বিরানায়; মুক্তিযুদ্ধ,
হায়, বৃথা যায়, বৃথা যায়, বৃথা যায়।

(*উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ;* শামসুর রাহমান)

বাংলাদেশ আর আমি প্রায় সমবয়সি। আমাদের জন্ম কাছাকাছি সময়ে, আমরা বেড়ে উঠেছিও প্রায় একইসঙ্গে। আমি যেবার স্কুলে ভর্তি হই, তার কয়েকদিন আগেই বাংলাদেশকেও ভর্তি করা হয় সেনাবাহিনীর পাঠশালায়। আমি কলেজে ভর্তি হতে হতে বাংলাদেশে সামরিক শাসনেরও দশ বছর পূর্তি হয়ে গেছে, আর আমি যখন কলেজ পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের খোলা জীবনে পা রাখলাম, বাংলাদেশও তখন সামরিক ভূত গা থেকে ঝেড়ে গণতন্ত্রের দিকে পা বাড়িয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি আমার চোখ দিয়ে যেন বাংলাদেশের স্বপ্নই দেখি।

যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা দুজনই জীবন শুরু করেছিলাম, সেই স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস শুরু হতে জন্মের পরে আর বেশিদিন লাগে নি। আমার এই লেখাটা আমার বাংলাদেশকে নিয়ে, বালক এবং কিশোরের চোখে দেখা স্বপ্নভঙ্গের গল্প, মুক্তিযুদ্ধের মূল সুর থেকে সরে আসার গল্প। আমি কোনো ইতিহাস বলতে চাইছি না, না কোনো গবেষণা প্রবন্ধ, এটা শুধু আমার নিজের অভিমানের গল্প। এই গল্পে নতুন কোনো অজানা তথ্য নেই।

১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে আমি স্কুলে ভর্তি হই। ভেবে দেখবেন সময়টা, মাত্র কয়েক মাস আগেই বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছেন তাঁর নিজের বাসায়, নিজের দেশের সেনাবাহিনীর একাংশের হাতে। সেনাবাহিনীর আরেক অংশ যে খুব বাধা দিয়েছিল তা নয়, মনে হয় সবাই মনে করেছিল সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলা বোধ হয় তাঁর প্রাপ্যই ছিল। অল্প কয়েকদিন পরেই জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসেছেন সিপাহী জনতার বিপ্লবে, দেশে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে, বহু প্রত্যাশিত শান্তি যেন পাওয়া গেছে।

মুজিব যখন নিহত হন, তখনো জেলে আটকা পড়ে ছিল অনেক যুদ্ধাপরাধী। এত মানুষকে হত্যা করেও একজনকেও ঝুলতে হয় নি ফাঁসির দড়িতে। জেলে ঢুকে এদের অনেকেই প্রাণে বেঁচেছে, নইলে হয়ত মুক্তিবাহিনীর হাতেই জীবন শেষ হতো ওদের। মুজিবের সাধারণ ক্ষমা ছিল শুধু "পাতি রাজাকারদের" জন্য, কিন্তু বড় রাজাকারগুলোকে কেন তিনি জেলের ভেতর পালছিলেন, সেটা আমার বোধগম্য হয় নি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হওয়ার প্রথম দোষটা আমি বঙ্গবন্ধুকেই দেবো। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে এদেরকে শুধু ছেড়েই দিলেন না, বরং ধীরেসুস্থে বেশ প্রতিষ্ঠিত করলেন তাদের। জিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন শাহ আজিজ, যিনি একজন স্বাধীনতাবিরোধী ছিলেন, গোলাম আযমও দেশে ফেরে একই সময়ে। এত কিছু সত্ত্বেও মানুষ কিন্তু ভোলে নি মুক্তিযুদ্ধকে। তখনো পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধও সেই দূরের কোনো ঘটনা নয়, মানুষের মনে তার স্মৃতি বেশ ভালোভাবেই জেগে ছিল।

আমাদের ক্লাস ওয়ানের পঁয়ত্রিশজন ক্লাসমেটের মধ্যে দুজন আছে যাদের বাবা মারা গেছেন যুদ্ধে। আমরা সবাই তাদের সমীহ নিয়ে দেখতাম, শিক্ষকরা স্নেহ করতেন বেশ, মাঝে মাঝে এগুলো নিয়ে কথা বলতেন। মনে আছে কয়েক বছর পরে ক্লাস ফাইভে উঠে নজরুল ইসলাম স্যার বেশ জোর করে ওদের ফ্রি স্টুডেন্টশিপ করে দেন। ওরা অবস্থাপন্ন ঘরের সন্তান, ওরা যথাসাধ্য আপত্তি জানাল, সরকারি স্কুলে বেতনই বা কত। কিন্তু স্যার নাছোড়বান্দা, শেষে উনি বললেন, "বাবা, তোদের জন্য কিছু করতে পারলে আমার নিজেরই ভালো লাগবে, আমার জন্য হলেও তোরা এটা নে।"

আমরা স্কুলের মাঠে বসে শুনেছি আমার শহীদ পরিবারের বন্ধুদের বাবাদের বীরত্বের গল্প। এঁদের একজন ছিলেন বিমান বাহিনীর তরুণ অফিসার, তাঁকে গুলি করে হত্যা করে তাঁরই এক সহকর্মী। তাঁর স্ত্রী, স্বামীকে হারান খুব অল্প বয়সে, দুটি ছোট বাচ্চা নিয়ে প্রায় অকূল পাথারে পড়েন তিনি। বাংলাদেশ বিমানে একটা চাকরি করতেন খালাম্মা, তাঁর মেয়েটাকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে দিয়েছিল, যক্ষের

ধনের মতো তিনি ছেলেটাকে মানুষ করছিলেন। ধরা যাক এই ছেলেটির নাম বারেক, আমার শৈশবের সহপাঠী। আমরা বা আমার বাকি সহপাঠীরা আজও ভুলি নি ওদের সেই কষ্টটা।

জিয়া নিজে একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, সেক্টর কমান্ডার ছিলেন, বীরউত্তম ছিলেন, এতগুলো বিশেষণ থাকার পরেও কেন তিনি দেশকে পাকিস্তানের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন? আমার কাছে মনে হয়েছে কারণটা হয়ত পুরোটাই রাজনৈতিক। তিনি আওয়ামী লীগের বিপরীতে একটা প্ল্যাটফর্ম গড়তে চেয়েছিলেন। জাসদ একটা দাঁড়ানো প্ল্যাটফর্ম ছিল, কিন্তু মুসলিমপ্রধান দেশে জাসদের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা "পাবলিক খাবে না", তাই ইসলামকেই পুঁজি করলেন তিনি, যদিও তাঁর ক্ষমতায় আরোহণের পিছে জাসদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আদর্শ- টার্দশ নিয়ে ভাবলে মনে হয় রাজনীতি হয় না।

জিয়ার আমলে খবরের কাগজ পড়লে ১৯৭১ সম্বন্ধে কোনোকিছু জানাটা খুব জটিল ব্যাপার বলে মনে হবে। স্বাধীনতা দিবস বা বিজয় দিবসে পত্রিকাগুলো ক্রোড়পত্র বের করত ঠিকই, কিন্তু সেগুলোতে কখনো পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বা রাজাকারদের উল্লেখ থাকত না। তার বদলে "হানাদার বাহিনী" আর "তাদের দোসর" বলা হতো। অনেকটা ভাসুরের নামের মতো, উহ্য রাখা হতো আসল ইতিহাস। সেই সময় পত্রিকা আর বইপত্র ছাড়া ইতিহাস জানার অন্য উপায় খুব কমই ছিল। স্বাধীনতার উপর খুব বেশি বইও লেখা হয় নি তখন, সুতরাং খুব আগ্রহী কেউ ছাড়া কারো পক্ষে সত্যিকারের ইতিহাস বের করা বেশ জটিল ছিল।

জিয়াউর রহমান অনেকগুলো সামরিক অভ্যুত্থান মোকাবিলা করেন, যেগুলো তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর হাতে দমন করেন। শোনা যায় তিনি সেনাবাহিনীর ভালো কোনো অফিসারকে নেতৃত্বে রাখেন নি, পাছে তারা ক্যু করে বসে! লম্পট জেনারেল এরশাদকে সেনাবাহিনীর প্রধান করা বোধ হয় তাঁর সেই নীতিরই প্রতিফলন, যদিও এটাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল বলে মনে হয় আমার। নিয়তির অনিবার্য পরিণতি একদিন জিয়ার ভাগ্যেও এলো। স্ত্রী- পুত্রকে ফেলে নিজের জীবন বাজি রেখে স্বাধীনতা যুদ্ধ করা এই সমরনায়ক যুদ্ধের দশ বছরের মধ্যে স্বাধীনতাবিরোধীদের পুনর্বাসিত করে বিদায় নিলেন রঙ্গমঞ্চ থেকে। নেতারা আসেন আর বিদায় নেন, "কৌশলগত কারণে" স্বাধীনতাবিরোধীদের ব্যবহার করেন, নিজেরা প্রাণ হারালেও রাজাকারগুলো কালস্রোতে টিকে যায় তেলাপোকার মতোই।

এরপর এরশাদের আগমন, একই পাকিস্তানতোষণ নীতি চলতে থাকল। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলটাও চিন্তা করতে হবে, সোভিয়েত ইউনিয়নকে আমেরিকার সাহায্যে আফগানিস্তানে নাস্তানাবুদ করেছে মুজাহিদিনরা। মৌলবাদীদের জয়জয়কার আর আমেরিকার পিঠ চাপড়ানিতে সারা দুনিয়া জুড়েই ওদের উত্থান। ইসলাম বেশ ভালো "মার্কেটেবল প্রোডাক্ট", সুতরাং লম্পট আদর্শহীন জেনারেল এরশাদ যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করবেন, সেটা আর আশ্চর্য কী? এক রসিক বড় ভাই বলেছিলেন যে কয়েকদিন পরে নিউটনের সূত্রেরও মুসলমানি হয়ে যাবে, পড়তে হবে "বিসমিল্লাহ্ বলে কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে, ইনশাল্লাহ্ তার ভরবেগের পরিবর্তন হবে।" রাষ্ট্রীয় মদদ পেলে যে কেউ আশকারা পায়, আমার মনে হয় বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থান জিয়ার আমলে শুরু হলেও, এরশাদের আমলে বেশ ভালো একটা অবস্থানে আসে এটা। শ্যাম চাচাও বেশ খুশি এদের উপর। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র জবাই হলে উনার কী যায় আসে? শিবিরের রগকাটা কার্যক্রমের শুরুও এই আশির দশকেই। যদিও এই মৌলবাদের "রিটার্ন মার্চেন্ডাইস" আমেরিকার কাছে ফেরার পর আজ ওরাই পয়লা নম্বর শত্রু হয়েছে আমেরিকার। আহারে, যদি আজকের এই বাস্তবতা থাকত সেদিন!

১৯৮৩ বা ৮৪ সালে বাংলাদেশ বিমানের পাইলটরা একবার ধর্মঘটে যায়। সেবার সিদ্ধান্ত হয় পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স থেকে কয়েকজন পাইলট এনে বিমান চালানো হবে। এ বিষয়ে পত্রিকায় একটা খবর দেখে চমকে উঠেছিলাম। এদের মধ্যে একজন পাকিস্তানি পাইলট আগে বিমানবাহিনীতে ছিলেন, হত্যা করেছিলেন একজন বাংলাদেশি অফিসার, আর কেউ নয় আমার বন্ধু বারেকের বাবাকে! শেষে কী হয়েছিল জানি না, কিন্তু অসীম ক্রোধ থেকে আমার সেদিন মনে হয়েছিল যে শুধু ইতিহাসবিকৃতি নয়, আত্মসম্মান পর্যন্ত এই জাতি বিলিয়ে দিচ্ছে।

এইরকম একটা পরিবেশে নয় মাসের যুদ্ধ ভুলতে বেশি দিন লাগার কথা নয়। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী প্রথম প্রজন্মের আমরাও ভুলতে শুরু করলাম ১৯৭১-কে। খেলার মাঠে পাকিস্তান দলকে নিয়ে লজ্জাজনক মাতামাতি শুরু হয় আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে। সেবার একটা আন্তর্জাতিক হকি টুর্নামেন্টের আয়োজন হয়েছিল। ১৯৮৮তে একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ব্যাপকভাবে দেশের তরুণ সমাজের পাকিস্তান প্রেম চোখে পড়ে। মজার ব্যাপার হলো আশির দশকের শুরুতে চট্টগ্রামে পাকিস্তান দল জনতার প্রহারের শিকার হয়েছিল (সেটা হয়ত দেশের জন্য কোনো ভালো ঘটনা না), তার কয়েক বছরের মধ্যেই পাকিস্তান দলকে পূজা করার মতো একটা বেশ

বড় তরুণগোষ্ঠী তৈরি হয়ে গেল, যারা অনেকেই আমারই বয়সি। স্কুলে খেলার মাঠে গোল করে বসে মুক্তিযুদ্ধের গল্প করা প্রজন্মও আনমনে পাকিস্তানের পতাকা নিয়ে লাফ দেয় খেলার মাঠে, আমাদের সমসাময়িক মেয়েরাও ইমরান খানকে চিঠি লেখে... খেলাতে নাকি রাজনীতি থাকতে নেই। কোনটা রাজনীতি, কোনটা আত্মসম্মান, সবই আমরা ভুলে গেছি আশির দশকের শেষে এসেই।

এরপরের গল্প রিকারিং ডেসিমেলের মতোই। নেতারা ইতিহাস ভুলিয়ে যা শিখিয়েছেন তাই আমরা শিখেছি। ইতিহাসবিস্মৃত আত্মসম্মানহীন জাতির ভাগ্যে যা জোটা উচিত, তাই জুটেছে। দুই দফা ক্ষমতায় এসে শেখ হাসিনাও যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন সেটা আমার মনে হয় নি, বরং তিনি জোর করে বঙ্গবন্ধুকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসটা ঠিকমতো উঠিয়ে আনলে যে মুজিব এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান, সেটা তাঁকে বোঝাবে কে? আজকে ব্লগগুলো পড়ে বুঝি যে, নতুন প্রজন্মের অনেকেই দেশের সবচেয়ে সম্মানের ইতিহাসটা জানতে এবং জানাতে চায়, সেইসঙ্গে নতুন বাংপাকি প্রজন্মও কিন্তু চোখে পড়ে। বাংলাদেশের সমবয়সি এই আমার আর আগের ক্রোধ নেই। সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক, মেধা মননে উন্নত একটা দেশের প্রত্যাশা নেই আর, আছে শুধু স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। ইতিহাস ভুলে গেলে ভবিষ্যৎও মনে হয় নড়বড়ে হয়ে যায়। আশির দশকে দেশে কোরবানির সময় উট আমদানি দেখে শামসুর রাহমান লিখেছিলেন তাঁর অমর কবিতা "উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ"। মনে হয় আজও আমরা সেই উটের পিঠে চড়েই উলটোপথে যাচ্ছি।

স্মৃতির শহর - ৪:
২৯ নম্বর বাড়ি

সজীব সকালে চোখ মেলি, প্রতিদিনের পৃথিবী
আমাকে জানায় অভিবাদন। টাটকা রোদ,
পাখিদের ওড়াওড়ি, গাছের পাতার দুলুনি, বেলফুলের গন্ধ
ডেকে আনে আমার বালকবেলাকে।

(*একটি দুপুরের উপকথা;* শামসুর রাহমান)

স্মৃতির শহর কিন্তু থাকার জন্য দারুণ! ওখানে না-গরম, না-ঠাণ্ডা, লোকজনের ব্যবহার মধুর, রিকশাভাড়াও বেশ কম। কলে পানি পাওয়া যায় ঠিকমতোই, ধুলাবালির প্রকোপ তেমন নেই, মশার উপদ্রব সহনীয়, অসুখ-বিসুখের বালাই নেই, কাজকর্ম করলেও চলে, না করলেও অসুবিধা নেই। লোডশেডিং শুধু পূর্ণিমা রাতেই হয়, সাথে একটু উতল হাওয়াও থাকে। বিনা টিকেট, বিনা পাসপোর্টে সেখানে ঢোকা যায়, যতদিন খুশি থাকুন সেখানে, কেউ কিছু বলবে না। আমি প্রায়ই যাই সেখানে, আমার ভূমিকা শুধু চোখ মেলে দেখা। আব্বাই সবকিছু সামলান, আমি তো বালক মাত্র। সকালে উঠে উনি আমাকে আইনস্টাইন আর সত্যেন বোসের গল্প শোনান। আমাকে মসজিদে নেওয়ার কথা উনার মনেই নেই। কোনো কোনো দিন ভোরে রেডিওতে ভাসে আব্দুল আলীমের উথালপাথাল সুর। আজম খানও যুদ্ধফেরত যুবক, গান তাঁর ক্রোধ আর অভিমান। রবীন্দ্রনাথ থাকেন ভিনাইল রেকর্ডে, আর ভাইয়ার দরাজ গলার কবিতায়। বৃষ্টির রাতে মাঝে মাঝে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত মথুরাপুরী ছেড়ে ভিজতে ভিজতে তেজগাঁয়ে চলে আসেন। এই শহরে না ফিরে উপায় আছে?

২৯ নম্বর বাড়িটা আজও টিকে আছে। স্মৃতি ও বাস্তবে, দুটোতেই। সময় ভায়া অত্যাচার কম করে নি, তারপরও সে পঁয়তাল্লিশ বছর টিকে গেল। একটু ঢুঁ মেরে দেখা যাক স্মৃতিময় বাসভবনে। একজন যুবককে দেখছেন, একটু রাগী রাগী? আমার বড় ভাই উনি। ঢাকা কলেজের রাগী তরুণ, লম্বা লম্বা চুল, স্বপ্নালু চোখ, পরনে বেলবটম। বুঝলেন, চুল কাটার কথা বলে বলে আব্বা হয়রান। বলেও বেশি লাভ নেই, ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষেরও (আলাউদ্দিন আল আজাদ?) লম্বা লম্বা চুল। পড়াশুনায় বেশি মন নেই, মন পড়ে আছে আড্ডা, নানান বইপত্র আর মাসুদ রানায়। ঘরে সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ। কয়েকদিন পরে সামরিক আইন জারি হলে নাপিতের দোকান থেকে দ্রুত চুল কাটিয়ে তিনি বাধ্য ছেলে হয়ে গেলেন। না হয়ে উপায় আছে? আর্মি যে রাস্তা থেকে লম্বা চুলের ছেলেদের ধরে চুল কেটে দিচ্ছে! ঢাকা কলেজের অমন দুর্দান্ত প্রিন্সিপাল স্যার, উনিও চুলটুল কেটে ফিটফাট। সামরিক আইন না এলে আমরা কীভাবে এত ডিসিপ্লিন শিখতাম?

দোতলায় গেলে আমাদের ঘরের পড়ার টেবিলে আমার মেজ ভাইকে দেখবেন। সুর্দশন এবং ফিটফাট, পড়াশুনাতে দারুণ মেধাবী। ভেতরে ভেতরে হয়ত একজন বিজ্ঞানীও বাস করে তাঁর মধ্যে। আমাদের বাসায় অনেকদিন কোনো অতিরিক্ত ঘড়ি ছিল না। আব্বা আর আম্মা অফিসে চলে গেলে স্কুলের সময় হয়েছে কি না বোঝার জন্য উনি চিলেকোঠার চালের ফুটো দিয়ে আসা সূর্যের রেখা দিয়ে একটা ঘড়ি বানিয়েছিলেন। সিঁড়িঘরের দেওয়ালে সময় লেখা ছিল, সূর্যের রেখা "১০: ০০" লেখাকে স্পর্শ করলেই বুঝতাম দশটা বেজে গেছে। বহু বহু বছর পরে বিদেশ থেকে ঘরে ফিরে সেই সিঁড়িঘরের এক চিলতে রোদ দেখে হঠাৎ যেন নিমেষেই ধরে ফেলি শৈশবকে।

ওই যে পেটা শরীরের একজন মাঝবয়সি লোককে দেখছেন, বাসার বাইরের সবুজ জায়গাটায়, বাগানের কাজ করছেন আর গুনগুন করে গাইছেন "আমি বনফুল গো", উনিই আমার বাবা। এই একটা গানই উনি জানেন। আমি উনার ৪৬তম জন্মদিনে জন্ম নেওয়া শেষ সন্তান। আমাদের সংসারে উনার ভূমিকা ব্যাপক কিন্তু নীরব। অনেকটা অপারেটিং সিস্টেমের মতো সর্বত্রই উনার নিঃশব্দ উপস্থিতি। আমাদের সবারই সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করেন, এই সংসারের উনি স্বরাষ্ট্র আর পূর্তসহ আরও অনেকগুলো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন। উনার শরীর সর্বদাই সুঠাম, খুব কমই অসুস্থ হয়েছেন তিনি। যৌবনে খেলাধুলা আর প্রচুর কায়িক শ্রমের সুফল আজও ভোগ করে চলেছেন। আমাদের আরাম- আয়েশ নিশ্চিত করে রাতে ঘুমাতে যান আর সবার আগে উঠে নানান কাজ শুরু করে দেন।

বাসার সামনে অমন সুন্দর বাগানটাও উনার তৈরি, এছাড়াও নানান ফলের গাছ লাগিয়ে উনি বাসাটাকে রীতিমতো নন্দনকানন বানিয়ে ফেলেছেন।

আমার আম্মাকে চিনেছেন? গম্ভীর মহিলা, আমেরিকার জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করেও থাকার চেষ্টা করেন নি সেদেশে। আর আমি তাঁর কুপুত্র এদের মাটি কামড়ে পড়ে আছি। আম্মা দারুণ সব গল্প বলতে পারেন, কাজের শেষে মুখে মুখে আমাদের অসাধারণ গল্প শোনান। আমি অনেক বছর তাঁর গল্প শুনেছি, ১০/১২ বছর বয়সেও উনি আমাকে মোটামুটি মুগ্ধ করে রাখতেন। আমি তাঁর গল্প শুনে বিশ্বাস করেছিলাম যে উনি আসলে পরীদের দেশ থেকে এসেছেন, হঠাৎ একদিন সেখানে চলেও যেতে পারেন। আমাদের পরিবারের বাজেট আম্মার হাতে, বলতেই হবে সেই বাজেটে অপচয় বলে শব্দ নেই। চেয়ার, টেবিল, বিছানা সবই নড়বড়ে। কয়েকদিন পরে তো মরেই যাব, কী হবে দামি জিনিস কিনে? এই নশ্বরতার চিন্তায় কোনো কিছুই কেনা হয়ে ওঠে নি। বাসার অনেক পর্দাই আম্মার পুরোনো শাড়ি দিয়ে বানানো, কোথাও কোনো বাহুল্য নেই। বিয়ের (১৯৫২) পরে কেনা দুটো চেয়ার এখনো আছে বাসায়। অনেক বছর পরে স্যাটায়ার ম্যাগাজিন অনিয়নে একটা নিউজ দেখে অট্টহাসি হাসতে হাসতে মায়ের কথা মনে পড়ে গেল।

আম্মা আমাদের শাসন বেশি করেন না, মাঝেসাঝে বকা দেন, আর বছরে শুধু একদিন ধরে আচ্ছা করে ধোলাই দেন। সমস্যা হলো বছরে কোনদিন ধোলাইটা দেওয়া হবে, সেটা আগে থেকে বলা থাকে না। অনেক দুষ্টুমি করে আজ পার পেয়ে গেলেও সামান্য কারণে তিনমাস পরে ধরা খাওয়ার চান্স আছে। মারের অনিশ্চয়তার ভয়ে সারা বছরই আমরা সিধে হয়ে থাকতাম।

আমাকে খুঁজে পাচ্ছেন না? ছাদে আছি মনে হয়। সিঁড়ি দিয়ে সোজা দোতলার ছাদে উঠে যান। চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিতে পারেন সত্তর দশকের তেজগাঁ, পুরো রাস্তায় পাঁচটা মাত্র বাড়ি, পূর্বদিকে একটু দূরেই ট্রেনের লাইন, আরেকটু দূরে তাকালে দেখবেন পুরোনো কিছু কলকারখানা, দিনটা যদি ভেজা ভেজা থাকে তাহলে নাবিস্কো কারখানার বিস্কুটের গন্ধও পাবেন, টাটকা এবং মনকাড়া। পশ্চিমে বিজ্ঞান কলেজের মাঠ, খ্রিষ্টানদের চার্চ আর কবরস্থান, হলিক্রস কলেজ। একটু দূরের তেজগাঁ বিমানবন্দরের প্লেনগুলো মনে হয় হলিক্রস কলেজের উপর দিয়েই যাওয়া- আসা করে। ছাদের পশ্চিম দিকে একটা পানির ট্যাঙ্ক দেখবেন, আমি সম্ভবত ট্যাঙ্কের নিচেই আছি, মাদুর বিছানো আছে মনে হয়। এইখানে বসেই চলে আমার বিশ্বভ্রমণ, শিবরাম থেকে মাসুদ রানা অনেক কিছুই পড়েছি

এইখানে। শৈশবে ফিরব অথচ ছাদে যাব না, তাও কি হয়? যদি ঝমঝম বৃষ্টি হয়, তবে দক্ষিণে তাকাতে ভুলবেন না, বিজ্ঞান কলেজের পুকুরে ব্যাঙদের কনসার্ট চলছে, আরেকটু দূরে তাকালেই দেখবেন পুকুরপাড়ের রাস্তাটা যেন মিশে গেছে বর্ষায়। এই ঝুম বৃষ্টিতে আপনি ভিজছেন অথচ ঠাণ্ডা লাগার ভয় নেই, টনসিল ব্যথা করবে না, কী আশ্চর্য স্মৃতির শহর!

সিগারেট থেকে ভালোবাসা, আড্ডা থেকে বিচ্ছেদ, বিদেশ যাত্রা থেকে বিয়ে, গায়ে হলুদ থেকে জন্মদিন, আর যা যা আছে জীবনের অনুষঙ্গ, সবই জানে এই ২৯ নম্বর। উজবুকের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেও আসলে সে সবজান্তা এক মিউজিয়াম। সময়ের নিষ্ঠুর হাত পড়েছে সব্বার উপর। বাড়িটাও মলিন হয়ে গেছে। চাইলেও ভাইয়া আর চুল বড় করতে পারবেন না। তিনি বাস করেন আরেক দূরদেশে, নিকোটিনকে নির্বাসনে দিয়েছেন বহু বছর হলো। যে যুবককে দেখলেন আজ, তাঁর সন্তানও সেই বয়সে পৌঁছে গেছে প্রায়। মেজ ভাইও ব্যস্ত, ক্লাস আর নানান প্রজেক্ট আর সেমিনারে, শৈশব মনে হয় অতিদূর সমুদ্রের পাড়ে, ধারে কাছে কোথাও নেই। আম্মা কর্কট রোগসহ আরও নানা ব্যাধিকে পরাভূত করে ক্লান্ত। আব্বা যেন নিজেই ইতিহাস এক, মাঝে মাঝে উনি অতীত আর বর্তমান ভুলে যান। আব্দুল আলীমকে কেউ মনে রাখে নি, সন্ন্যাসী উপগুপ্ত এদিকে আর আসেন না তেমন, আজম খানও বুড়ো হয়ে গেছেন আর আমাকে রেখে গেছেন মাঝ বয়সের কাছাকাছি কোনো নির্জন জায়গায়। তবুও কিন্তু বালকবেলায় ফিরতে পারি এক লহমায়, যেকোনো সকালে চায়ের কাপে, নিঃসঙ্গে বা সংসর্গে...

স্মৃতির শহর - ৫:
ইশকুল

আমি যদি হই ফুল, হই ঝুঁটি- বুলবুল হাঁস
মৌমাছি হই একরাশ,
তবে আমি উড়ে যাই, বাড়ি ছেড়ে দূরে যাই,
ছেড়ে যাই ধারাপাত, দুপুরের ভূগোলের ক্লাস।

(*রুমির ইচ্ছা;* নরেশ গুহ)

আমাদের ইশকুলে যাবেন? আচ্ছা আচ্ছা বলে দিচ্ছি কীভাবে যেতে হবে। ফার্মগেট থেকে ঢাকা কলেজে যাওয়ার টেম্পো ধরবেন, এটাকে আমরা হেলিকপ্টার বলি। উঠলেই বুঝবেন নামকরণ কতখানি সার্থক। ভটভট শব্দে কানের পোকা আর ঝাঁকুনিতে বাতের ব্যথার অনেকখানি উপশম হতে পারে। যাওয়ার পথটা কিন্তু দারুণ, একদম "সিনিক"। হেলিকপ্টার আপনাকে গ্রীন রোড ধরে সোজা কাঁঠালবাগান পার করে উড়িয়ে নিয়ে যাবে গ্রীন কর্নারের সামনে দিয়ে, পাশে ধানমন্ডি সাত নম্বর রোডের দিঘির মতো বড় পুকুর একটা। একটা জমজমাট রেস্তরাঁ পড়বে পথে, নাম ভুলে গেছি, ইচ্ছে ছিল বড় হয়ে কাবাব খাবো ওই দোকানের, কিন্তু আমি বড় হতেই ওটার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে। সায়েন্সল্যাব পার হয়ে যখন আপনি ঢাকা কলেজের সামনে নেমেছেন, মাত্র দশ মিনিট পার হয়েছে! বিশ্বাস হচ্ছে না? না হওয়ারই তো কথা, এখন বিএমডব্লিউ হাঁকিয়েও আপনি এই পথ দশ মিনিটে পার হতে পারবেন না। স্মৃতির শহরে মনে হয় প্রতিদিনই হরতাল চলে!

ঢাকা কলেজের সামনে নেমে মরণচাঁদের মিষ্টির দোকানে একটু খাবেন নাকি? ইশকুল শুরু হতে বাকি আছে আরও কিছু সময়। ঠিক সাড়ে দশটায় মালুম ভাই ঘণ্টা পেটাবেন। মালুম ভাই হচ্ছেন আমাদের স্থায়ী ঘণ্টাবাদক, বয়স মনে হয় একশ- টেকশ হবে! পাকিস্তানি সেনারা বন্দুক দিয়ে পিটিয়ে সামনের দাঁতগুলো ভেঙে দিয়েছে, কিন্তু তাও হাসিটা কী অমলিন! আমার নাম বললে চোখ ছলছল করে পুরোনো গল্প বলা শুরু করবে, গায়ে হাত বুলিয়ে আদরও করতে পারে। স্মৃতির শহরে দয়া, মায়া আর ভালোবাসা সব এখনো অটুট আছে, ওখানে আমরা কাউকেই ভুলি নি অথবা কেউ কাউকে ছেড়ে যাই নি।

দেরি হয়ে যাচ্ছে না? আমার তাড়া নেই যদিও। যাহোক ইশকুলে ঢুকতে হবে কিন্তু মূল দরজা দিয়ে নয়, বরং পেছনের দরজা দিয়ে। কেন? আমরা তাই করি যে! আপনি করবেন কী, ঢাকা কলেজের পাশের টিচার্স ট্রেনিং কলেজের গেট দিয়ে ঢুকবেন। ঢুকেই মনে হবে ইন্দ্রপুরী! কী সুন্দর একটা বাগান! দুইদিকে উঁচু উঁচু গাছ আর মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা চলে গেছে বড় একটা মাঠের পাশ দিয়ে। এইটা গাড়িওয়ালা লোকের জন্য না বরং আমজনতার পায়ে চলার রাস্তা। আপনি রাস্তা ধরে পশ্চিম দিকে হাঁটতে থাকুন। আমি দশ বছর হেঁটেছি এই পথে, এখনো মাঝে মাঝে এক- আধটু যাই ওইদিকে। পথের শেষ মাথায় কিন্তু কয়েকজন ভিআইপির দেখা পাবেন। এঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে চটপটি মামু, আমড়া মামু, আচার মামু আর আইসক্রিম মামু। এঁদের নামই বলে দেয় উনাদের কী পেশা। আমার নাম বললে বাকিতে খেতে পারবেন সব জায়গায়, শুধু আইসক্রিম মামু কোনো বাকির ব্যবসা করেন না। আমড়া মামু নিজেও দুপুরে আমড়া খান, সেই সি- ভিটামিনের জোরেই হয়ত দশ বছর আগেও আমার চেয়ে জোয়ান ছিলেন। চটপটি মামুও মাটির মানুষ, টক দিতে কোনো কার্পণ্য নেই তাঁর। আচার মামু প্রায় ম্যাজিশিয়ান, কবিরাজি ওষুধের মতো একটা পুরিয়া মিকশ্চার করে দেবে, একদম যেন অমৃত।

যাক, উনাদের ব্যবসার জায়গাটা পার হতেই দেখবেন তারকাঁটার দেয়ালে এক চিলতে একটা ফাঁক, একটু ঢাল, নামতেই ব্যস আমাদের ইশকুল। খান মুহাম্মদ সালেক স্যারের বানানো আর আমাদের ধ্বংস করা। শুনেছেন ছড়াটা, আমাদের স্কুলটা হলুদ, ছাত্রগুলো বলদ, বেঞ্চিগুলো সরু, মাস্টারগুলো গরু? ইশকুলটা আসলেই হলুদ, আর আমরা অল্প কয়েকটা বলদ আছি এইটুকুই যা সত্য, বাকি সবই উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা!

আপনি তো ভাই স্কুলে ঢুকে পড়লেন, আপনার পরনে কী আছে? আমাদের ড্রেস কিন্তু সাদা শার্ট আর নীল প্যান্ট। জিন্স না পরলেই ভালো, স্যারেরা খুব ভালো চোখে দেখেন না এই বস্তু। উনারা পুরোনো আমলের লোক, জিন্স পরলে ভাববেন আপনি পাট নিচ্ছেন। আচ্ছা বলুন তো, কোনো মানে হয়? জিন্সের মতো সস্তা আর আরামের কাপড় আছে আর? যাহোক হাঁটতে থাকুন সামনে আরেকটু। আমাদের মাঠটা কত বড় দেখেছেন? তবে একটু সাবধানে যাবেন, দুর্ধর্ষ স্যার আছেন কয়েকজন। টাইগার স্যার, হালদার স্যার, রুহুল আমিন স্যার আর মতিউল্লাহ স্যার। যার টাইটেল টাইগার, তাঁর সামনে না পড়াই ভালো। হালদার স্যার এমনিতে ভালো মানুষ কিন্তু রেগে গেলেই রুদ্রমূর্তি। মতিউল্লাহ স্যার আপনাকে গত বার্ষিক পরীক্ষায় অঙ্কের নম্বর জিজ্ঞেস করতে পারেন, কম নম্বর পেলে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা। রুহুল আমিন স্যার একটু রাশভারী, সালাম দিয়ে সরে আসাটাই বরং ভালো। ভয় পাইয়ে দিয়েছি? ভয় নেই ভাই, আমরা তো রোজ আসছি আর যাচ্ছি, প্রতিদিন কি আর মার খাই?

ওই যে বালকগুলোকে দেখছেন, ওরাই হচ্ছি আমরা। পরনে সাদা শার্ট আর নীল প্যান্ট, দূর থেকে সব একরকম লাগছে। এমনকি কাছে আসলেও একই রকম লাগতে পারে। আমার তো এখনো একই লাগে। ওইখানে বড়লোকের ছেলেও যেমন আছে, তেমনি আমাদের দারোয়ান মোখলেস ভাইয়ের ছেলে ইদ্রিসও আছে। সবাইকে একই হাঁড়িতে সিদ্ধ করেন স্যারেরা। ধনী- গরিব কোনো ভেদাভেদ নেই তাঁদের কাছে, সবাইকে মেরে তক্তা করে দেন, মনে হয় এইজন্যেই তো আমরা এত সমাজতন্ত্রী। একই হাঁড়িতে সিদ্ধ না হলে আর কমরেড কীসের? ভাই, নিচু হয়ে বালকগুলোর হাফ প্যান্টের নিচের দিকে তাকাবেন না কিন্তু। গার্মেন্টস শিল্প বলে কিছু নেই স্মৃতির শহরে, গ্রামের গরিব মেয়েরা মানুষের বাসাতেই কাজ করে মরে, গার্মেন্টসে নয়। তাই আমাদের জামাগুলো দর্জিবাড়িতে বানানো, দুইটা লাফ দিলেই পটাস, একদম জায়গামতো প্যান্ট ছেঁড়া। আমরা লজ্জিত নই যদিও, তবু ক্লাস টেনের দুষ্টু ছেলেগুলো কেন জানি হাসাহাসি করে।

একটু ঘুরে দেখা যেতে পারে চারদিক। একটু দূরেই মাঠে মোখলেস ভাই জাতীয় পতাকা উঠিয়েছেন, স্কুল শুরুর পরেই আমরা এখানে এসে জাতীয় সংগীত গাইব। আমাদের যাদের গলা দিয়ে হাঁসের মতো ফ্যাঁসফ্যাঁসে শব্দ বের হয়, তারা শুধু ঠোঁট মেলাব। ভুল সুরে জোরে গাইলে আমাদের জোবেদ আলী স্যার গদাম করে মাথায় চাটি বসিয়ে দেবেন কিন্তু! উনি নিজে এ কাজটা করার সময়ও জাতীয় সংগীত গাইতে থাকেন। অ্যাসেম্বলি শেষ হলেই ক্লাস শুরু হয়। ছোটদের চার পিরিয়ড আর বড়দের আট পিরিয়ড। মনে হয়

এটাই সবচেয়ে বিপদজনক সময়। অঙ্ক, বাংলা, ইংরেজি অথবা বিজ্ঞান সব ভুলেরই একটাই শাস্তি, সেটা হলো মার। স্কুলের অফিস রুমে নানান সাইজের বেত আছে, কখনো কখনো স্যারেরা ক্ষেপে গেলে জবা গাছের ডাল ভেঙেই হামলা চালান, কেউ কেউ আবার মাথার ছয় ইঞ্চি উপর থেকে এমন গাট্টা মারেন যে চোখে অন্ধকার দেখতে হয়। শিক্ষার যে কোনো রাজকীয় পথ নেই, তা বেশ বুঝেছি আমরা।

স্কুলের বিল্ডিংটা অনেক বড়, অনেকগুলো করিডোর। সবখানেই আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি। আমাদের আপনি ক্লাস থ্রির সামনে জবার বাগানেও পাবেন, আবার স্কুলের পেছনের দিকে টিফিন ঘরের কাছেও পাবেন। স্কুলের সামনের দিকে হেড স্যারের রুমের আশেপাশে ঘুরঘুর করা বালকগুলোও আমরা, দোতলায় গেলেও আমরা আছি, আবার স্কুলের দেওয়াল টপকে যেই ছেলেগুলো পালাচ্ছে, তারাও কিন্তু আমরাই। ঝমঝম বৃষ্টি হলে করিডোরগুলোতে পানি প্রায় উঠি উঠি অবস্থা আর আমাদেরও মহানন্দ তাতে। কেন জানি স্মৃতির শহরে প্রায়ই ঝুম বৃষ্টি হয় আজকাল। আজকে সময় প্রায় শেষ, আমার বন্ধুদের সাথে আপনার শিগগিরই পরিচয় করিয়ে দেবো, এরাও অনেকে বালকবেলায় ফেরার জন্য আমারই মতো ব্যাকুল।

[এই পর্ব আর এর আগের পর্ব প্রায় একই সময়ে লিখেছি, কিন্তু এই পর্ব লিখতে গিয়ে মন বিবশ হয়েছে অনেকবার। স্কুলের অনেক স্যার আর নেই, একজন সহপাঠীও ছেড়ে গেছেন আমাদের। স্মৃতির শহর ছাড়া আর কোথাও তাঁদের পাওয়া যায় না। একদিন আমরা সবাই তো শুধু স্মৃতির শহরেরই বাসিন্দা হবো। অনেক স্যার দারিদ্র্যের সাথে শেষ বয়সে এসে যুদ্ধ করেছেন, আমাদের অনেককেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন কিন্তু প্রতিদানে কিছুই পান নি। আমরা স্বার্থপরের মতো ভুলে গেছি যে একটা সাফল্যের পেছনে বহু মানুষের নীরব শ্রম থাকে, আমাদের সাফল্যগুলো আমাদের পুরো একার নয়। তেমনি আমাদের ব্যর্থতাগুলোর সব দায়ও হয়ত আমাদের না। সাফল্যের প্রবল আনন্দে অথবা ব্যর্থতার বাঁধভাঙা দুঃখে আমরা যে দুটোই ভুলে যাই।]

স্মৃতির শহর - ৬:
তিনি বৃদ্ধ হলেন

একটি ছেলে ঘুরে বেড়ায় কবির মতো কুখ্যাত সব পাড়ায় পাড়ায়।
আর ছেলেরা সবাই যে যার স্বার্থ নিয়ে সরে দাঁড়ায়-
বাবা একলা শিরদাঁড়ায় দাঁড়িয়ে থাকেন, কী যে ভাবেন,
প্রায়ই তিনি রাত্রি জাগেন, বসে থাকেন চেয়ার নিয়ে।

(*চামেলী হাতে নিম্নমানের মানুষ;* আবুল হাসান)

"আব্বু উইঠা পড়ো, সাড়ে ছয়টা বেজে গেছে।"
"হুমমম..."
"আব্বু ক্লাস মিস কইরা ফেলবা।"
"হুমমম..."
"উইঠা পড়ো..."

গাঁইগুঁই করতে করতে আমি বাথরুমে যাই। বেসিনের পাশেই রাখা গরম পানির কেতলি। সকালে ঠাণ্ডা পানি লাগলে আমার আবার হাঁচি হয়। বাথরুম-টাথরুম সেরে খাওয়ার টেবিলে গেলেই নাস্তা রেডি। ভাবছেন আমি স্কুলে যাচ্ছি? উহুঁ হলো না, আমি রীতিমতো দামড়া ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। সকালে যুদ্ধ করে আমাকে উঠাচ্ছেন আমার বাবা। আমাকে ঠেলেঠুলে নানান কৌশলে

তড়িৎকৌশলী বানানোটা অনেকটা তাঁরই অবদান। অধীর আগ্রহ নিয়ে আমাকে প্রকৌশলী বানাচ্ছেন, যদিও তাতে আমার বিন্দুমাত্র তাড়া নেই। ক্লাসে গিয়ে গেট আটকানো দেখলে ক্যাফেতে বসে নরক গুলজার করি! যত ব্যগ্রতা শুধু আব্বার।

আমি তাঁর সর্বশেষ সন্তান। ততদিনে উনি রিটায়ার করেছেন, নানান কাজে ব্যস্ত রাখেন নিজেকে। এর মধ্যে আমাকে ঠেলাঠেলি অন্যতম। সকালে বাজার করেন নিষ্ঠার সাথে, দরাদরি (উনি বলেন মুলামুলি) ছাড়া জিনিস কেনা মানেই তো ঠকা। বাসায় ফিরে দিনে অন্তত একবার সাদা ছোট আলমারিটা খোলা হয়। বেশ কড়া সিকিউরিটি সেটার। ভেতরে কী আছে? টাকা- পয়সা নয়, দুনিয়ার তাবৎ অকাজের জিনিস। আমাদের পাশের বাড়ির আপা আমাদের বাসা নিয়ে একটা রচনা লিখেছিল, সেটা ভাঁজ করা আছে সযতনে। আছে কিছু ডায়েরি যেখানে বাবা ধরে রেখেছেন আমাদের শৈশবসহ আরও অনেক অ- দরকারি গল্প। একটা ওয়াটার গান পাবেন, আমিই আমেরিকা থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম, এই ভয়াবহ স্টার ওয়ার্স মার্কা অস্ত্র দিয়ে উনি গাছে পানি দিয়েছেন, তাও মনে হয় বেশি দিন নয়। এই স্মৃতির শহরের কয়েকটা পর্বও হয়ত খুঁজে পাবেন সেখানে, অফসেটে প্রিন্ট করা হার্ড কপি। কয়েকটা পুরোনো টাকার ফাঁকে ফাঁকে আরও কিছু অতি পুরোনো জিনিস খুঁজে পাবেন, যেখান থেকে শুধু স্মৃতির গন্ধই ভেসে আসে। আচ্ছা স্মৃতির গন্ধ কি ন্যাপথালিনের মতো?

আব্বার উপদেশগুলোও আলমারির জিনিসগুলোর মতোই অকাজের। মাথা ধরা, জ্বর, সর্দি, কাশি, দাদ, হেপাটাইটিস, অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজিজ যাই হোক না কেন, উনার উপদেশটা কী, শুনবেন? ‘‘প্রচুর পানি খাইবা।’’ নিজেও ওই জিনিস বিস্তর ‘‘খাচ্ছেন’’, অন্যকেও ‘‘খেতে’’ অনুপ্রাণিত করে চলেছেন। আরও জটিল কোনো রোগ যেমন ডিপ্রেশন অথবা পিত্তথলির প্রদাহে আক্রান্ত হলে আরও একটা দুটো এক্সট্রা উপদেশ পাবেন, ‘‘একটু রেস্ট আর লাইট এক্সারসাইজের দরকার।’’ অসুখ নিয়ে উনার সামনে গেলে আপনিও এইসব প্রেসক্রিপশন পাবেন নিশ্চিত। তবে সমস্যা কী জানেন, ইদানীং আমারও একই অবস্থা! আমার কাছে আসলে আমিও একই উপদেশ দিতে পারি। ভাগ্যিস আমি ডাক্তার নই! জীবন নিয়েও উনার উপদেশ বেশ সাদামাটা, ‘‘কারোটা খাইবা না’’, বেশ ভালো একটা উপদেশ নিঃসন্দেহে। পিতার কাছ থেকে পাওয়া এই অল্প কয়েকটা উপদেশ কাঁধে নিয়ে বেশ চালিয়ে যাচ্ছি, অর্ধেক জীবন শেষে নিজে আরও গোটাদুয়েক যোগ করেছি এর সাথে। দেখা হলে সব একসাথে দিয়ে দেবো, মোটামুটি পাঁচ মিনিটের ব্যাপারই তো।

বসার ঘরে আব্বা যেই চেয়ারটায় বসে আছেন, ওটার বয়স আব্বার চেয়ে বছর ত্রিশেক কম হবে। আমার উচিত ঈদের দিন সকালে চেয়ারটাকেও সালাম করা। আব্বা এই সকালে উঠে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পত্রিকা পড়ছেন সেখানে বসে, আর মাঝে মাঝে স্বগতোক্তি করছেন... "চোরেরা"... এটা কাদের বলা, বুঝলেন তো? চোরদেরকে বলা, যেই চোরগুলো চুরি করছে আমাদের অতীত থেকে শুরু করে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত সবকিছু। আব্বার জামার বোতামগুলোর দিকে আপনার নজর পড়েছে বোধ হয়? বাদ দেন ভাই, অনন্তকাল ধরে উনি উলটোপালটা লাগাচ্ছেন ওগুলো, মনে হয় এরকমই চলবে।

ডেন্টিস্টদের কাছে যেতে আমার ব্যাপক ভয়, সেই শৈশব থেকে শুরু করে আজ অব্দি। বুঝলেন, ধাড়ি হওয়ার পরেও আব্বা সাথে নিয়ে গেছেন ডেন্টিস্টদের কাছে, তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন ব্যাটাদের উপর। আজকে এই আমাকে একা পেয়ে ওরা ইচ্ছেমতো বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে আমার দাঁতের, আর কিছু হলেই লম্বা লম্বা বিল... চোরেরা!

আব্বার শখটা কী শুনবেন? ম্যাজিক! উনি আসলেই একজন ম্যাজিশিয়ান। জুয়েল আইচের মতো না হলেও কম নয়। আপনি দড়ি কাটা আর তাসের ম্যাজিক দেখতে পাবেন আমাদের সেই বাসভবনে। খালি খাতা হঠাৎ আঁকিবুঁকিময় হয়ে যাবে উনার জাদুর লাঠিতে। তবে আপনার বয়স যদি দশের আশেপাশে হয়, তবে উপভোগ করবেন সবচেয়ে বেশি। তবে উনার আসল জাদু মনে হয় বাগানকর্মে, যেকোনো পতিত জমি উনি কী মায়ামন্ত্রবলে সবুজ করে দেন, এই বিদ্যা আমার এখনো অজানা। আমি গাছ লাগালেই যেন ওঁত পেতে থাকে হাজার সমস্যা, নিজেকে মনে হয় বৃক্ষহন্তারক!

এখন এখানে সকালে বিকট স্বরে ডাক দেয় একটা অ্যালার্ম ঘড়ি, নাছোড়বান্দা হলেও একদম স্নেহ নেই তার গলায়। সকালে বাথরুম থেকে বের হয়ে নিজেই বানিয়ে নেই চা আর কিছু অখাদ্য। তারপর দেশের টিভি নিউজ দেখতে দেখতে মনে হয় আমার ছিয়াশি বছরের যুবক বাবাও হয়ত দেখছেন একই পচনশীলতার খবর, উনার সেই বিরক্তি আজ আমিও ধারণ করি। মোটা ফ্রেমের চশমা, সাধারণ একটা জামা আর লুঙ্গি পরনে, বসে আছেন প্রাগৈতিহাসিক চেয়ারে। আমিও দূরে নেই, এই তো একদম প্রায় পাশেই। ভৌগোলিক দূরত্ব ভেদ করে সেই বনস্পতির ছায়ারা যেন পৌঁছে যায় এই শহরে। নীরব ও নির্জন এই সকালে ভালোই কেটে যায় সময়টা। স্মৃতির শহর কিন্তু মন্দ নয়, কী বলেন?

স্মৃতির শহর - ৭:
হাবিবিয়া লাইব্রেরি

বুকের মধ্যে বাহান্নটা মেহগনি কাঠের আলমারি।
আমার যা কিছু প্রিয় জিনিস, সব সেইখানে।
যেসব মেঘ গভীর রাতের দিকে যেতে যেতে ঝরে পড়েছে বনে, তাদের শোক,
যেসব বনপাখির উল্লাস উড়তে গিয়ে ছারখার হয়েছে কুঠারে কুঠারে... তাদের কান্না,
যেসব পাখি ভুল করে বসন্তের গান গেয়েছে বর্ষার বিকেলে, তাদের সর্বনাশ...
সব ঐ আলমারির ভিতরে।

(*বুকের মধ্যে বাহান্নটা আলমারি;* পূর্ণেন্দু পত্রী)

বইয়ের দোকানকে কেন লাইব্রেরি বলে এই প্রশ্নের জবাব আজও পাই নি। এরকম না পাওয়া অনেক প্রশ্নের ‘‘এক্স- ফাইল’’ তৈরি আছে মনের ভেতর। উত্তর পাবো, এই আশাও রাখি না। আজকের গল্প ফার্মগেটের একটি ‘‘লাইব্রেরি’’- কে নিয়ে। আমাদের তেজগাঁর বাসা থেকে দশ মিনিটের হাঁটা দূরত্বে ফার্মগেট। বড় ব্যস্ত এই জায়গা। বাসগুলো রাস্তা আটকে লোক উঠাচ্ছে আর নামাচ্ছে। পাশের ফুটপাথে বিক্রেতারা হাজারো পণ্যের পসরা সাজিয়ে হাঁকডাক দিচ্ছে, সিদ্ধ ডিম থেকে পরকালে যাবার চাবিকাঠি সবই বিক্রি হচ্ছে দেদারসে। রিকশা, অটোরিক্সা, টেম্পো কেউ কোনো নিয়ম মানার ভেতরে নেই, পুলিশ স্যার খুশি থাকলেই হলো। বারো আনা পয়সা থেকে আধখাওয়া বিড়ি, সবই গ্রহণযোগ্য পুলিশের কাছে। উনাদেরকে সর্বভুক না বলে আগুনকে কেন সর্বভুক বলা হয় সেই প্রশ্নেরও

সুরাহা হয় নি। একটু দূরেই "আনন্দ" সিনেমা হল, একটু ভালো করে তাকালে সেখানে রাজ্জাক আর কবরীর স্বর্ণযুগ দেখা যাবে সুনিশ্চিত। পাশের ওভারব্রিজটাতে অনেক মানুষ উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করছে, আমাকেও হয়ত পাবেন ওদের ভিড়ে। একটা ছোট পার্কও আছে, এই দুপুরবেলাতে সেখানে ঝিমাচ্ছে কিছু মেয়ে যাদের অফিস খুলবে সন্ধ্যা হলেই। আরও আছে বায়ুদূষণ, বিকটদর্শন সব ভিখিরি আর সর্বরোগের ঔষধ বিক্রেতারা। আমার জীবনে দেখা প্রথম "মুক্তবাজার" হচ্ছে এই ফার্মগেট।

হাবিবিয়া লাইব্রেরি ছিল ফার্মগেটের মোড়েই। আমি এখন এটাকে হয়ত একটা নিউজস্ট্যান্ডই বলব। দোকানে ঢোকার উপায় নেই কোনো, ক্রেতারা সব বাইরে দাঁড়িয়ে। ক্রেতার চেয়ে পাঠকই বেশি, কেউ পাঠ করছেন দৈনিক পত্রিকা, কারো মনোযোগ সাপ্তাহিকে, কেউ গিলছেন প্রগতি বা সেবা প্রকাশনার বই, কেউ ধর্মীয় বই পড়ে হাফেজ হচ্ছেন, আর কেউবা ঝোলাঝুলি করছেন রসময় গুপ্তের বইগুলো একটু পাওয়ার জন্য। ফার্মগেট এলাকার বহুমুখী চরিত্রটা অনেকখানিই ধারণ করে এই হাবিবিয়া লাইব্রেরি। আমি এগারো বছরের বালক দেখতে এসেছি আনন্দমেলা পত্রিকাটা এসেছে কি না। আনন্দবাজার পাবলিশার্সের এই কিশোর পত্রিকাটা পাক্ষিক বের হয় কলকাতা থেকে, ঢাকায় আসতে প্রায় দুই সপ্তাহ লেগে যায়। টাকা আর রুপির বিনিময় হারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দুই টাকা দামের এই পত্রিকার দাম বাংলাদেশে রাখা হয় ছয় টাকা। তাও সই, পাতা উলটালেই যে আছে আনন্দের সম্ভার, বলতে হবে ছয় টাকা কমই দাম। মলাটের ভেতর আছেন কাকাবাবু, সন্তু, কেইন শিপটন, ক্যাপ্টেন হ্যাডক, গবা পাগলা, অম্বর সেন, উইং থেকে গোল, শব্দকল্পদ্রুম, রোভার্সের রয়, গাবলু, ক্লাস টেনের ফার্স্ট বয়, হারানো কাকাতুয়া, বসু বাড়ি আর শৈশবের ভুলে যাওয়া সব গল্প আর ছবি।

"আজকেও আসে নাই ভাইয়া, কালকে আসতে পারে, কী একটা ধর্মঘট চলতাসে", বিক্রেতার সস্নেহ জবাব।

আবার সেখানে যাই পরদিন। পত্রিকাটা হাতে পেলে সুট করে ঢুকে যাই পাশের রেস্তরাঁ "হোটেল সাইনু পালোয়ান"- এ। ওখানের লাচ্ছি আমার খুবই পছন্দের, দই আর বরফের ভালোবাসার এই পরিমিতিবোধ আর কেউই দেখাতে পারে নি। লাচ্ছি সাবাড় করতে করতে দ্রুত পাতা উলটাই, বাসায় গেলেই আনন্দমেলাতে ভাগ বসাবে অনেকেই। শুনেছি আনন্দ নাকি ভাগ করলে বেড়ে যায়, তবুও কেন আমার এই স্বার্থপরতা!

আমি বড় হতে থাকি, হাবিবিয়াতে গেলে আমিও আনমনে নাড়াচাড়া করি গুপ্তবাবুর বইগুলো। দোকানি দেখেও না দেখার ভান করে। ক্রেতা হচ্ছে লক্ষ্মী, তাকে নীতিকথা বলে পায়ে ঠেলার কোনো মানে হয়? তাছাড়া আগের বুড়ো দোকানির সাথে এক ছোকরা বসে এখন। হিসেব করে দেখলে আমার চেয়ে অল্পই বড় সে। ক্রেতাদের চরিত্রে কোনো পরিবর্তন নেই, আমি না খুঁজলেও কেউ না কেউ কিনছে আনন্দমেলা। ছোকরা দোকানিই সব সামলায়। গ্যাংগ্রিনে কাটা পড়েছে বুড়োর একটা পা, পেটের ক্ষিধে তাও কমে না, তাই হয়ত রিটায়ারমেন্টে যাওয়া আর হয়ে ওঠে নি। বিষণ্ণ বুড়োটা সারাদিন ঝিমায়, একটু খিটখিটে হয়ে গেছে তার মেজাজ, একটু আয়েশ করে কেউ কিছু দীর্ঘক্ষণ ধরে পড়লেই সে তেতে উঠে।

ফার্মগেট আমার শৈশবের প্রিয় ভ্যাকেশন স্পট, কারণে অকারণে প্রায়ই যেতাম সেখানে। একদিন সকালে হাঁটতে গিয়ে দেখি বিশাল জমায়েত। রাজউকের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ চলছে। এই প্রথমবারের মতো জানলাম হাবিবিয়া লাইব্রেরি আর হোটেল সাইনু পালোয়ান দুটোই অবৈধ। একটু দূরে নতুন তৈরি হওয়া একটা আধুনিক বার্গারের দোকান, সেটাও নাকি অবৈধ। হাজার হাজার উৎসুক জনতার সামনে ভাঙা হলো সবগুলো স্থাপনা। চোখের সামনেই ধ্বংস হলো হাবিবিয়া লাইব্রেরি। বুড়োর হাউমাউ কান্নাতেও কারো মন গলল না, দ্রুত কার্যকর হলো হাবিবিয়া লাইব্রেরির মৃত্যুদণ্ড। এরশাদের আমল তখন, উনার কথাই আইন, উনি চাইছেন ফার্মগেট আরও সুন্দর হোক। তাছাড়া সাধারণ মানুষের হাহাকারগুলোও বেশিদূর যেতে পারে না।

এর কয়েকদিন পরে দেখলাম ছোকরা দোকানিকে। আগের দোকানের কাছেই এবার ফুটপাথে পাটি বিছিয়ে বেচছে দৈনিক পত্রিকা আর ম্যাগাজিন। এবারের দোকানের অবৈধতা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। বুড়োকে দেখলাম না আর ধারেকাছে। ছোকরা জানাল বুড়ো অসুস্থ। ওই পথ দিয়ে আসা যাওয়া ছিল, প্রায়ই কথা হতো ছোকরার সাথে। একদিন শুনলাম বুড়ো মারা গেছে। আমার বইয়ের আগ্রহ তখন নানামুখী, হাবিবিয়া আর পূরণ করতে পারে না সেই চাহিদা, তাও মাঝে মাঝে কথা হয় দোকানির সাথে। বিদেশে আসার আগেও বিদায় নিয়েছি সেই দোকানির কাছ থেকে।

কয়েক বছর আগে দেখলাম কলকাতা থেকে বইপত্র আনার সার্ভিস চালু হয়েছে। আমি এক বছরের জন্য গ্রাহক হয়ে গেলাম আনন্দমেলা পত্রিকার। আমার বয়স তখন ছত্রিশ, আমার কন্যারা দুইয়ের নিচে। ঠিক কে হবে এই পত্রিকার পাঠক সেটা আমি নিজেই বুঝলাম না। কলকাতা থেকে রাজিব চক্রবর্তী প্রথম সংখ্যাটা পাঠিয়ে আমাকে ই- মেইল করে দিলেন, জানালেন সাত থেকে দশদিনের

মধ্যেই পেয়ে যাব আমি। এই এক কথায় আমি ক্লাসে ফাইভে ফিরে গেলাম, প্রতিদিন চিঠির বাক্স হাতড়াই সেই বালকবেলার আগ্রহ নিয়ে। মাঝে মাঝে ফিরে আসে হাবিবিয়া লাইব্রেরি, ছিমছাম এই পাড়ার নৈঃশব্দ ঠেলেঠুলে ফার্মগেটও এসে দাঁড়ায় তার কলরবময় আপন সৌন্দর্য নিয়ে। সেই প্রথম পাঠ, কোলাহলমুখর নগরী, পুলিশের দুর্নীতি, রাজ্জাক, কবরী, ফুটপাথের বিক্রেতা, ভিখিরি আর দুঃখী দুঃখী চেহারার "নষ্ট" মেয়েরা আসতে লাগল দল বেঁধে। তারপর সত্যি একদিন ডাকপিয়ন নানান বিলের সাথে রেখে গেলেন মলাটবন্দি আনন্দ। পড়ন্ত বিকেলবেলার শেষ আলোয় চিঠির বাক্সের চাবি খুলে আমি যেন আবিষ্কার করে নেই এক টুকরো স্মৃতির শহর। কী আশ্চর্য এই শহর, সময় যেন ওখানে স্থির হয়ে আছে কী এক মায়ামন্ত্রবলে! এইজন্যই কি কাজ ফেলে এখানে আসা হয় এত ঘন ঘন?

স্মৃতির শহর - ৮:
জাতিস্মর

এইসব সন্ধ্যা, রাত্রি, অলসঘুমের পড়ন্ত বিকেল...
এইসব মানুষ ও লোকায়ত সময়
মনে হয় সবই বিগত জন্মের স্মৃতি-
কোনো এক দুর্বোধ্য কারণে ফিরে ফিরে আসে।
(*অহর্নিশ ফেরার;* তারেক রহিম)

আমি দেশ ছাড়ি ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে। দিনটাও মনে আছে, আগস্ট মাসের পাঁচ তারিখ। গুমোট একটা গরম ছিল সেই সকালে। আকাশটাও অনেক মেঘলা ছিল, সেই রঙের সাথে মিল রেখে আমার মনটাও ছিল বেশ ভারী। বর্ষা আমার প্রিয় ঋতু, কিন্তু সেই সকালের প্রবল বর্ষণটা আর দেখা হয় নি, ম্যাকডোনাল্ড ডগলাসের বিমানটা বৃষ্টির আগেই আমাকে একটানে নিয়ে গেছে অনেক দূরে। ছিল দুটো স্যুটকেস, তাতে বোঝাই বঙ্গবাজারের বেঢপ কাপড়চোপড়, কিছু পড়ার বই, জীবনানন্দ আর শামসুর রাহমানের কবিতা। আমার যা কিছু পার্থিব সম্পত্তি সব এঁটে গেছে সত্তর পাউন্ডের দুটো বাক্সে। স্যুটকেসে আঁটে নি শুধু দীর্ঘশ্বাস, বরং বুক থেকে সেটা বেরিয়ে এসেছে ক্ষণে ক্ষণে। আমেরিকা নাকি মানুষকে গিলে ফেলে, আবার ফিরতে পারব তো এই শহরে? কেউ কি অপেক্ষায় থাকবে?

বিমানবন্দরে বন্ধুরা সবাই ছিল, মা আর বাবা ছিলেন। এর আগে একবার কলকাতায় গিয়েছি একা, কিন্তু ওটাকে তো ঠিক বিদেশ বলে মনে হয় না। এবার সত্যি সত্যি বিদেশ যাচ্ছি, একদম গাঁকগাঁক করে ইংরেজি বলা বিদেশ! বন্ধুরা নানান হালকা রসিকতা করছে... "গিয়া আমার নাম জিগাইস..." "কী হবে জিগাইলে?" "দেখবি কেউ চিনে না... হা হা হা।" "দোস্ত আমগোরে একটু... পত্রিকা... পাঠাইস।" "পাঠামুনে।" "আর শোন মন খারাপ করিস না... পড়াল্যাখা শেষ কইর‍্যা চইল্যা আইস, তাইলেই খেলা শেষ... যা এইবার খালাম্মার কাছে যা..." সুবোধ বালকের মতো আমি মায়ের কাছে যাই। উনিও আশ্বস্ত করেন নানানভাবে। "এইতো অল্প কয়টা দিন মাত্র। খাওয়া- দাওয়া করবে নিয়মিত আর শরীরের যত্ন নিবে।" আব্বার উপদেশও প্রায় কাছাকাছিই। আমি জ্বরের ঘোরলাগা রোগীর মতো মাথা নাড়ি। আম্মা আর আব্বা দুজনেই বেশ উৎফুল্ল আমার "উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশগমনে"। একসময় আমারও ডাক পড়ে, আমি ইমিগ্রেশন পেরিয়ে দূর থেকে দেখি আমার স্বজনদের। পুলিশকে ঘুষ দিয়ে বন্ধুরাও ঢুকেছে কেউ কেউ। আম্মা আর আব্বা চোখ মুছছেন নীরবে, এই অশ্রুটা এতক্ষণ যেন আমার ভয়ে কোথাও লুকানো ছিল, আমি সরে যেতেই তারা সদর্পে মাঠ দখল করেছে। আমি হারিয়ে যাই দ্রুত পায়ে... কতকাল আগে... মনে হয় এইতো সেদিন।

আমার গন্তব্য ছিল পশ্চিম টেক্সাসের ছোট একটা শহর। নাম লাবোক। শহরটা ছিমছাম, বিশ্ববিদ্যালয়টা খুব সুন্দর। লাবোকে গরম যেমন পড়ে, তেমনি শীতের সময় তুষারপাতও হয়। আমি এসেছি আগস্ট মাসে, গরমটাই প্রধান। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার আশপাশ ছাড়া টেক্সাসের রাস্তায় কেউই হাঁটাহাঁটি করে না, শুধু হুসহুস করে বিশাল দর্শন সব গাড়ি ছুটে যায়। আমাদের বাসাগুলো মনে হয় শহরের সবচেয়ে সস্তা, রীতিমতো ভাগ্যহত না হলে এখানে কেউ থাকবে না। ক্লাস শুরু হতে বাকি আছে কিছুটা সময়। আমি দিনের বেলায় কাজ খুঁজছি আর রাতে "সম্পূর্ণ বাংলাদেশে চিত্রায়িত" স্বপ্ন দেখছি। এর মধ্যে একটা স্বপ্ন ছিল এয়ারপোর্ট থেকে স্যুটকেস ফেলে বাসায় চলে এসেছি বন্ধুদের সাথে হৈ হৈ করতে করতে... জেগে উঠে দেখি ছোট অ্যাপার্টমেন্টের জানালা দিয়ে আরও ছোট একটা আকাশ দেখা যাচ্ছে, গাঢ় নীল রঙের সেই ভোরের অচেনা আকাশে একফোঁটা মেঘ নেই, অথচ ঢাকার আকাশ নিশ্চয়ই এখন নিকষ কালো, রিকশায় করে ফুলার রোডে ঘুরতে দারুণ লাগত! সুমন চট্টোপাধ্যায় ঢাকায় আসছেন প্রথমবারের মতো, আমার বন্ধুরা সবাই দেখতে যাবে "তোমাকে চাই", আর আমি শালা গভীর রাতে আন্ডারগ্র্যাড ছাত্রদের হোমওয়ার্কের খাতার পাঠোদ্ধার করছি। আমেরিকানদের হাতের লেখা এত খারাপ!

সামনেই বিয়ে করছে এক বন্ধু। এই নিয়ে নানান পরিকল্পনা শুনতে পাই। সবাই চাকরিবাকরি জোগাড় করেছে, আড্ডাগুলোতে জলযোগ হয় প্রচুর। বনানী বাজারের অবৈধ মদ্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে "মাল" কেনা হয় নিয়মিত। এরামের বারে কিংবা কারো বাসায় হঠাৎ বসা মাইফেলের খবর পেলে চিনচিন করে ওঠে বুকের পাঁজর। সবাই কি আমার কথা ভুলেই গেল? সবই তো চলছে নিয়মমাফিক, আব্বা- আম্মাও বেশ আছেন মনে হয়, শুধু বাসাটা নিঃশব্দ হয়ত, আমার ঘরে বন্ধুদের হৈ হুল্লোড় নেই, ঘরদোর মনে হয় অনেক পরিষ্কার থাকে। আমিই শুধু এই পোড়ার দেশে মোটা মোটা সাহেবদের সাথে অনবরত অনুবাদ চালিয়ে যাচ্ছি, এতে কী লাভ এই মহাপৃথিবীর? খিস্তি উগরে দেই সকাল- বিকেল। ফোনের খরচ মিনিটে দুই ডলারের কাছাকাছি, কথাও বলতে পারি না। দেশে একটা ভাঙা মডেম ছিল, যেটা দিয়ে ই- মেইল চেক করে এক বন্ধু। সে- ই সবকিছু জানায়। মানুষ পুত্রশোকও ভুলে যায় একদিন আর এটা তো একটা শহর মাত্র! আমিও আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হতে লাগলাম এই দেশে। স্বপ্নগুলো ধীরে ধীরে পালটাতে লাগল, এগুলো এবার "সম্পূর্ণ বিদেশে চিত্রায়িত"। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার খবর রাখতে লাগলাম, দেখলাম এদের খাবারগুলোও মন্দ নয় তেমন, পানীয়গুলো একদম বৈধ, গুরু- শিষ্য সবাই পান করছেন দেদারসে। সাইনফিল্ডের কমেডিগুলো দারুণ জনপ্রিয়, আমি আঠার মতো লেগে থাকি জর্জ কস্টাঞ্জার সাথে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের হোমকামিং বা ক্যারল অফ লাইটসের মতো অনুষ্ঠানগুলোও মিস দেই না। হলিউডের ছবি আগে থেকেই দেখতাম, এক ডলারে একটু পুরোনো ছবি দেখার থিয়েটারের খোঁজ পেলাম একটা, সেখানে হাজিরা দেই নিয়মিত। একটা আধা ভাঙা গাড়ি কিনলাম, সেটা নিয়ে ঘুরে বেড়াই এদিক ওদিক। বন্ধু- বান্ধব জুটে গেল বেশ কিছু, আড্ডাগুলোও মন্দ লাগল না। দিন কেটে যেতে লাগল, অনেক দূরে পড়ে থাকা একটা শহরের কথা মনে হয় আমি ভুলেই গেলাম।

আমার বয়স বাড়তে লাগল। নানান ধান্ধায় আমি, কখনো নতুন চাকরির ধান্ধা, কখনো ধান্ধা ভ্যাকেশনে যাবার। সবসময়েই নতুন কোনো পরিকল্পনা। আমার গা থেকে ঢাকা শহরের গন্ধ উবে গেছে মনে হয়। দেশে ফোন করা অনেক সস্তা হয়ে গেছে, কিন্তু দামি হয়ে গেছে আমার সময়। বিয়ে করেছি, সংসারে নতুন অতিথি আসছে, বাড়ির দাম পড়ে গেছে, কেনার মনে হয় এটাই আসল সময়। দুই স্যুটকেস হাতে নিয়ে অচেনা শহরে আসা যুবক কোথায় যেন চলে গেছে। আমার পার্থিব জিনিসগুলোও আর দুই বাক্সে ধরবে না, পুঁজিবাদের মজাটা আমিও জেনে গেছি বোধ হয়। পাঁচই আগস্টের সেই আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে। গিলেই মনে হয় ফেলেছে এই দেশ আমাকে, যদিও আমি টেরই পাই নি কখন গলধঃকরণ করেছেন আমাকে শ্যাম চাচা!

বেশ কয়েকবছর আগে দেখলাম বাংলাদেশের চ্যানেল এনটিভির গ্রাহক হওয়ার বিজ্ঞাপন। এনটিভি ভালো না খারাপ সেটাও জানি না, শুধু এর মালিকের নাম (দুর্নাম?) মাঝে মাঝে পত্রিকাতে দেখি। নিয়ে নিলাম এনটিভি। টিভি দেখার অভ্যেস দেশে থাকতেও বেশি ছিল না। ইনস্টলেশনের দিন দুপুরে বাসায় লাঞ্চ করতে আসলাম। দেখলাম বিটিভির খবর হচ্ছে। এতবছর পরেও খবরের কোনো উন্নতি নেই, প্রতিবেলাই কি দেখতে হবে এই জিনিস? নাহ্... দেখলাম নানান উপাদেয় জিনিস দেখা যায়। কখনো ঢাকায় জলাবদ্ধতা, কখনো গরম, কখনো ঠাণ্ডা, কখনো রাস্তা আটকে মিছিল, কখনো পহেলা বৈশাখের মেলার সংবাদ। সকালে অন্যরা ওঠার আগেই আমি দেখি সংবাদগুলো। অনেক উন্নত হয়েছে সংবাদসহ অনেক অনুষ্ঠানের মান। ঢাকার রাস্তাগুলো দেখলেই অনেক স্মৃতি ভেসে ওঠে, হারিয়ে যাওয়া সেই যুবক মনে হয় ফিরে আসে ক্ষণিকের জন্য হলেও। পলাশী, সায়েন্স ল্যাব, ধানমন্ডি, লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুর, শ্যামলী, ইন্দিরা রোড, শুক্রাবাদ, কলাবাগান, এলিফ্যান্ট রোড, ফার্মগেট, মিরপুর, মগবাজার, গ্রীন রোড, নিউমার্কেট, রাজারবাগ, বনানী, গুলশান, উত্তরা, মালিবাগ, শাহবাগ, টিএসসি, বিজয়নগর তোমাদের কথা মনে পড়ে যায় ঠিকঠাক, গত জন্মের স্মৃতির মতো।

স্মৃতির শহর - ৯:
কবি

ব্যস্ত সমাজের থেকে কবিতার নির্বাসন হয়ে গেছে কবে।
সফল ও সুখী মানুষেরা আজকাল কবিতার ধারও ধারে না,
সুপ্রাচীন সুতীব্র আর্তিতে ভরা মায়াবী শিল্পের দিক থেকে
সম্পূর্ণ ফিরিয়ে পিঠ বেশ আছে সুসভ্য প্রজাতি।
(*অলৌকিক প্রতিশোধ;* কৃষ্ণা বসু)

তিনি তল্লাবাগেই থাকতেন তখন। আমারও ওই পাড়ায় নিয়মিত আনাগোনা। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে বসে আছি, ক্লাস শুরুর নাম নেই, পুরো বেকার। সারাদিন আড্ডা চলে, সুনীলের ভাষায় বন্ধুপ্রীতি প্রায় সমকামীদের মতোই। গলির মাথায় সিগারেট কিনতে গেলে মাঝে মাঝে দেখা হয় তাঁর সাথে, কখনো কখনো তিনি পরিচিত হাসিও দেন, মনে হয় পাড়ার একজন বখাটে যুবকই ভাবেন আমাকে। আর আমিও তাঁকে বলতে পারি নি যে আমি তাঁকে যেটুকু চিনি, মনে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি তিনি আমাকে চেনেন। তাঁর চেয়ে ভালো করে আমার কথাগুলো কেউ কোনোদিন বলে নি, আমার দুঃখ, ক্রোধ আর ভালোবাসা আর কেউ তাঁর মতো করে স্পর্শ করে নি, আমার স্মৃতির শহরকে আর কেউ এভাবে ভালোবাসে নি। সরকারি মিথ্যে প্রেসনোট আর স্বৈরাচারের বুটের নিচে বেড়ে ওঠা যৌবন যার, মনে হয় তার জন্যই তিনি লিখেছেন...

প্রধান সড়কে আর প্রতিটি গলির মোড়ে মোড়ে
কাঁটামারা জুতো ঘোরে। এরই মধ্যে হতচ্ছাড়া মন
তোমার সংকেত পায়, হৃদয়ের সাহসের তোড়ে
আমরা দুজন ভেসে চলি রূঢ় পথে স্বপ্ন বেয়ে।
(পুলিশও প্রত্যক্ষ করে)

কবি সারাজীবন কাটিয়েছেন এই শহরে এবং সেই জীবনের প্রায় পুরোটাই দিয়েছেন কবিতার পেছনে। পুরোনো ঢাকা শহরের অলিগলি উঁকি দিয়েছে কবিতায়, যত্রতত্র হানা দিয়েছে শৈশবের হলুদ রঙের বিকেল। নোংরা আর ময়লা মুছে ফেলে এই শহর যেন বিশুদ্ধ হয়েছে তাঁর কবিতায়। জয়দেবপুরের দিকে গেলে চৌরাস্তার মোড়ে আমি দেখি পোস্টারে ছাওয়া গোলচক্কর, ঝালমুড়ি বিক্রেতা, আর তার উপরে দাঁড়িয়ে আছে এক পাথুরে মুক্তিযোদ্ধা, রাইফেল হাতে অবিচল, আর উনি দেখছেন...

কখনো কখনো মনে হয় তোমার পাথুরে বুক
ঘন ঘন স্পন্দিত নিশ্বাসে। হে অজ্ঞাত বীর, শোনো,
তোমার সংগ্রামী স্মৃতি মাছের কাঁটার মতো লেগে
আছে আমাদের বিবেকের শীর্ণ গলায় নিয়ত।
(জয়দেবপুরের মুক্তিযোদ্ধা)

বিবেক মনে হয় আমাদের একটু শীর্ণই বটে, স্বৈরাচার কিনে নিয়েছিল বুদ্ধিজীবী থেকে ছাত্রনেতা, কবি থেকে টিভি উপস্থাপক। সেই একই বাণিজ্য আজও চলছে অবাধে, কাউকে কিনছে দুই ফ্লেভারের জাতীয়তাবাদ, কেউ নিজেকে বেচছে মৌলবাদের কাছে, ইতিহাস কিনছে ফোন কোম্পানি, কেউবা নতজানু খতিবের সামনে। শিক্ষকরাও নানান রঙে নিজেদের সাজিয়ে উপস্থিত এই মুক্তবাজারে। কবি কীভাবে এতকিছু দেখে ফেলেন?

শুনেছি স্বৈরাচারের প্রতিবাদে সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন উনি। কবিতা ছাড়া অন্য কিছুতে বেশি মন দেন নি, ফলে নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়তে হয়েছে অনেকবার, তবু পণ্য হয় নি তাঁর প্রতিভা। তাই যখন নূর হোসেন গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ে জিরো পয়েন্টে, আমার অসীম ক্রোধ আর অসহায়তা যেন তাঁরই কলমের নিবে...

শহরের টহলদার ঝাঁক ঝাঁক বন্দুকের সীসা
নূর হোসেনের বুক নয় বাংলাদেশের হৃদয়
ফুটো করে দেয়; বাংলাদেশ
বনপোড়া হরিণীর মতো আর্তনাদ করে, তার
বুক থেকে অবিরল রক্ত ঝরতে থাকে, ঝরতে থাকে।
(বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়)

বেঁচে থাকলে কেমন লাগত আজ তাঁর ক্ষমতার সমীকরণে স্বৈরাচারকে মসনদের কাছাকাছি দেখে?

তাঁর কবিতায় দেশচিন্তা এসেছে বহুবার। উদ্ভট যে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম উলটো পথে, সেই যাত্রা মনে হয় শুধুই বেগবান হয়েছে। আমি বিষাদে ও বিবমিষায় উগরে দিয়েছি খিস্তি, আর তিনি চেয়েছেন দেশদ্রোহী হতে...

হে- পাক পারওয়ার দিগার, হে বিশ্বপালক,
আপনি আমাকে লহমায়
একজন তুখোড় রাজাকার করে দিন। তাহলেই আমি
দ্বীনের নামে দিনের পর দিন তেলা মাথায়
তেল ঢালতে পারব অবিরল,
গরিবের গরিবী কায়েম রাখব চিরদিন আর
মুক্তিযোদ্ধাদের গায়ের চামড়া দিয়ে
ডুগডুগি বানিয়ে নেচে বেড়াব দিগ্বিদিক আর সবার নাকের তলায়
একনিষ্ঠ ঘুণপোকার মতো অহর্নিশ

কুরে কুরে খাব রাষ্ট্রের কাঠামো, অব- কাঠামো।
(একটি মোনাজাতের খসড়া)

তাই তো মনে হয় সাদামাটা আর নির্বিরোধী জীবনযাপন করেও শিকার হয়েছিলেন মৌলবাদী হামলার, বেঁচেও গেছেন ভাগ্য আর হয়ত মানুষের ভালোবাসার জোরে। পরিণত বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়। টিভিতে দেখেছি তাঁর শেষ শ্রদ্ধায় হাজার মানুষের ঢল, অনেকেই হয়ত পড়েন নি তাঁর কবিতা তবু নাগরিক শহরের খুব কাছের মানুষ তিনি। আমি তার অনেক আগেই ছেড়ে এসেছি স্মৃতির শহর, কবি ও কবিতা দুই থেকেই দূরে। প্রাত্যহিক জীবনের চাপে আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম ফেলে আসা জীবনের কথা। তিনি গত হওয়ার পরদিন "পরবাস" পত্রিকার সমীরদার কাছ থেকে তাঁর একটা বই জোগাড় করি, পরবাসে ছোট একটা লেখাও লিখেছিলাম তাঁকে নিয়ে। আবার বহু বছর পর তাঁর কবিতা ফিরে এলো আমার কাছে পুরোনো প্রেয়সীর মতো। আর গত জন্মের স্মৃতির মতো ফিরে এলো শৈশব, কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের গল্পগুলো। কাঠখোট্টা এই বাস্তবের পাশেই আরশি নগরের মতো স্মৃতির শহরের খোঁজ পেয়ে গেলাম।

এরপর ঢাকা থেকে এনেছি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন, আনন্দ ও বেদনায় আঁকড়ে রাখি বইটাকে, কখনো চোখের জলে বইয়ের পাতা ভিজে গেলে সন্তর্পণে মুছে রেখে দেই শেলফে। মাঝে মাঝে ব্যস্ত দিনের কাজের ফাঁকে বাচ্চুর মতো এক অবুঝ বালক এসে আমাকেও বড় জ্বালাতন করে। কাজ ফেলে সেই বালকের সঙ্গে ঢুকে যাই স্মৃতির শহরে, মিথ্যে হয়ে যায় যা যা কিছু পার্থিব আছে এই সংসারে। ক্ষণিকের জন্য ভুলে যাই আমার সময়ও সুমিষ্ট পিঠার মতোই ভাগ করে খাচ্ছে সবাই। কবি, আপনার সাথেই যেন চলে আমার এই আশ্চর্য ভ্রমণ।

বাচ্চু তুমি, বাচ্চু তুই চলে যাও চলে যা সেখানে
ছেচল্লিশ মাহুৎটুলীর খোলা ছাদে। আমি ব্যস্ত, বড় ব্যস্ত,
এখন তোমার সঙ্গে, তোর সঙ্গে বাক্যালাপ করার মতোন
একটুও সময় নেই। কেন তুই মিছেমিছি এখানে দাঁড়িয়ে
কষ্ট পাবি বল?

. . . .

চিনতিস তুই যাকে সে আমার
মধ্য থেকে উঠে
বিষম সুদূর ধু- ধু অন্তরালে চ'লে গেছে। তুইও যা, চ'লে যা।
(দুঃসময়ের মুখোমুখি)

স্মৃতির শহর - ১০:
আশ্চর্য ভ্রমণ

মনে মনে বহুদূর চলে গেছি - যেখান থেকে ফিরতে হলে আরও একবার জন্মাতে হয়,
জন্মেই হাঁটতে হয়...
হাঁটতে- হাঁটতে হাঁটতে- হাঁটতে একসময় যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানে পৌঁছুতে পারি!
পথ তো একটা নয়-
তবু, সবগুলোই ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে শুরু আর শেষের কাছে বাঁধা...

(*মনে মনে বহুদূর চলে গেছি;* শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

বই পড়ার অভ্যেসটা আমার বেশ অল্প বয়সেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশে টেলিভিশনের তখন একটাই চ্যানেল, তার সাথে যুদ্ধ করে বিনোদন মাধ্যম হিসাবে বইয়ের টিকে থাকা বেশ ভালোই সম্ভব ছিল। বন্ধুদের অনেকেই প্রচুর বই পড়ত, আমাদের বাসাতেও অনেক ধরনের বই ও পত্রিকা আসত। আমি আনন্দমেলা পড়তাম নিয়মিত। বাংলাদেশে ছোটদের পত্রিকা বলতে ছিল "কিশোর বাংলা" আর "ধানশালিকের দেশে"। মুহাম্মদ জাফর ইকবালের "দীপু নাম্বার টু" মনে হয় কিশোর বাংলাতেই বেরিয়েছিল। কিশোর সাহিত্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গের উপরই বেশি নির্ভরশীল ছিলাম। সুনীল, শীর্ষেন্দুসহ প্রায় সব নামজাদা লেখকই নিয়মিত লিখে চলেছেন কিশোর সাহিত্য। ফেলুদাসহ সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য বইও বের হচ্ছে হরহামেশা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা অনেক পুরোনো হলেও সেটার আবেদন ফুরায় নি, সত্যি বলতে কী, টেনিদার গল্প পড়তে আমার এখনো দারুণ লাগে।

আমাদের বাসায় দেব সাহিত্য কুটিরের পূজা সংখ্যার স্তূপ ছিল, সবচেয়ে পুরোনো সংখ্যাটার নাম ছিল রাঙারাখি, যেটা বের হয়েছিল চল্লিশের দশকে, আর সবচেয়ে নতুনটার নাম ছিল ইন্দ্রনীল, সম্ভবত সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বের হওয়া। দেব সাহিত্য কুটির মনে হয় আনন্দ পাবলিশার্সেরও আগের আমলের, ওদের পূজা সংখ্যাগুলো ঝকঝকে অফসেটে ছাপা হতো, হার্ড কভারের মলাট আর দারুণ বাঁধাই ছিল বইগুলোর। দেব সাহিত্য কুটিরের অস্তিত্বও মনে হয় নেই আর আজকে।

আম্মার কাছে শুনেছিলাম যে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে শিশু কিশোরদের জন্য অনেকগুলো পত্রিকাই বের হতো। রংমশাল, মৌচাক, শিশুসাথী, শিশু সওগাত। আমি সেগুলো চোখেও দেখি নি। আনন্দ পাবলিশার্স "সেরা সন্দেশ" বের করাতে সেগুলোও কিছু পড়া হয়েছে, যদিও সন্দেশ মনে হয় ষাটের দশকের পত্রিকা। দুঃখজনক হলো সে তুলনায় আমার শৈশবে অনেক কম পত্রিকা ছিল বাচ্চাদের জন্য। এখনকার অবস্থা হয়ত আরও করুণ। তবে সেই সময় কোনো দুঃখ ছিল না, বাসা থেকে হাঁটাপথ দূরে খালার বাসার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে পনেরো হাজারের বেশি বই ছিল। আমার ডুব দেওয়ার মতো প্রচুর রসদ ছিল সেখানে। বই পড়ে পড়ে আমার মনটা বেশ কল্পনাপ্রবণ হয়ে গিয়েছিল, দৈনন্দিন জীবনের বাইরের একটা জগৎ ছিল, একদম আমার নিজস্ব।

বইয়ের পাশাপাশি ছেলেবেলায় অভ্যেস ছিল উদ্দেশ্যহীন হাঁটারও। একেকদিন হাঁটা দিতাম একেকদিকে, কোনো গন্তব্যে নয়। ঢাকা শহরটাও তখন এলোমেলো হাঁটার জন্য মন্দ ছিল না। বিকেলে বেরিয়ে সন্ধ্যার একটু আগে বাসায় পৌঁছাতে পারলেই কোনো ঝামেলা নেই। আমি হেঁটে তেঁজগা স্টেশনে যেতাম, প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে রেললাইন ধরে হাঁটতে থাকতাম। মাঝে মাঝে রেললাইনের নুড়ি পাথরে ছোট একটা লাথি দিয়ে দেখতাম কতদূর নিতে পারি। তখন ঢাকায় ফাইভ স্টার হোটেল যেমন তৈরি হচ্ছে, তেমনি বাড়ছে ছিন্নমূল মানুষের ভিড়। রেললাইনের পাশে গড়ে উঠছে বস্তি, ঢাকা আস্তে আস্তে মেগাসিটি হতে চাইছে। আমার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, মাথার মাঝে সদ্য পড়া ভ্রমণকাহিনি, চারপাশের জমে ওঠা দুঃখকষ্ট আর আবর্জনা আমাকে স্পর্শ করে না। আমি ভাবছি আনন্দমেলাতে পড়া মানস সরোবরে ভ্রমণকাহিনি, এই উত্তর দিকেই তো সেটা। এই পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে এই শহরের কোলাহলগুলো পেরিয়ে, জয়দেবপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর পার হয়ে ইন্ডিয়া আর ভূটান পার হলে তিব্বতে পৌঁছানো যেতে পারে। আমি হাঁটছি আর মাথার ভেতর ছবি আঁকছি দূরের কোনো দেশে পাহাড়ের মাঝে শুয়ে আছে এক বিশাল হ্রদ। ভূগোলের অসম্ভাব্যতাকে পরাজিত করে আমার কল্পনার সেই সরোবরের পাশেই আছে প্যাগোডার মতো মন্দির, আর তার পেছনেই চিরহরিৎ গাছের সারি, গেরুয়া পরা

সন্ন্যাসী আর নাম না জানা সব ফুলের সমারোহ। সেই হ্রদের জলে কি রাজহাঁস সাঁতার কাটে? মনে হয় না, ঠাণ্ডায় তো সব জমে বরফ হয়ে থাকার কথা।

হাঁটতে হাঁটতে নাখালপাড়ার রেলক্রসিংয়ে পৌঁছে মনে হয়, এইবার ফেরা উচিত। হোমওয়ার্কের কাজ অনেকটাই বাকি। প্রায় প্রতিদিনই স্কুলে এর জন্য নানান হেনস্তা হতে হয়। আমি তখনো ঢাকা শহরের বাইরেই বেশি যাই নি, মধ্যবিত্ত পরিবারে ভ্রমণটা প্রায় বিলাসিতাই। কিন্তু ফেরার পথে হয়ত অন্য কোনো দেশে ভ্রমণ হয়ে যায়। এভাবে হেঁটে হেঁটে আমি আল্পসের আশেপাশে গিয়েছি, মিশরের পিরামিড দেখেছি, টেমস নদী দেখেছি, আমেরিকার রকি পর্বত পর্যন্ত দেখেছি। তেজগাঁ থেকে রমনা পার্ক, সংসদ ভবন, নাবিস্কো আর নাখালপাড়ার সীমাবদ্ধতায়ও যে পুরো পৃথিবী ঘোরা যায়, সেটা সেই সুদূর শৈশবেই জানা হয়ে গেছে।

ঠিক করা ছিল বড় হয়েই ঘুরতে বের হবো, যতটা পারব ঘুরে দেখব এই পৃথিবী। জীবনের লক্ষ্যের কাছাকাছি না হলেও আমি যখনই পেরেছি তখনই মোটামুটি চষে বেড়িয়েছি। কিন্তু কোনো ভ্রমণই শৈশবের সেই ভ্রমণকে অতিক্রম করতে পারে নি। কল্পনার রথে চড়ে যে যাত্রা, তাকে জেট প্লেন, রেন্ট- এ- কার, ট্রেন বা বাস কীভাবে হার মানায়? এই যে প্রতিদিন সকালে গান শুনতে শুনতে অফিসে আসার সময় ঢুঁ মেরে আসি নয়াটোলা বা পলাশী, সেটা আমার মনের সেই রকেটের মতো দ্রুতগতির গাড়িটা না থাকলে কীভাবে পারতাম? শৈশবে পড়া বইগুলোকে ধন্যবাদ, এই গাড়ির কারিগর মনে হয় ওরাই। এই রথে চড়ে আজ আর দুনিয়া চষে বেড়াই না, বরং টুক করে ঢুকে যাই অনেক দূরে পড়ে থাকা এক অভিমানী শহরে। ওখানে মায়ের হাতে সন্তান খুন হয় না, সপরিবারে কেউ আত্মহনন করে না, রাস্তায় পিটিয়ে মানুষ মারা হয় না, মলম পার্টি কারো জীবন কেড়ে নেয় না, ওখানে এখনো ভালোবাসা হারিয়ে যায় নি, গাছের ডালে পাখিরা ঠিকই ডাকাডাকি করে, ভোরের কুয়াশা ঠেলে রোদের আলো পৌঁছে যায় সবার বাসায় বাসায়। ফেরিওয়ালার হাঁকডাক, রেলগাড়ির শব্দ, রিকশার টুংটাং, ঠ্যালাগাড়ির ক্যাঁচক্যাঁচ যেমন শুনতে পাই, ঠিক তেমনি দেখতে পাই হলদে রঙের লম্বা বিকেলে খেলার মাঠে বালকদের বল পেটানো।

এখন আমার যাত্রাগুলো যেন শৈশবের দিকেই, বেলা কিংবা অবেলায় কী আশ্চর্য এই ভ্রমণ!

স্মৃতির শহর - ১১:
পরিসীমা

আমি আবার ফিরে এলাম,
স্নিগ্ধ কাক, আলাপচারী তালচড়াই
আমাকে আজ গ্রহন করো।
বহুদিনের নির্বাসনের কাতর চিহ্ন আমার সর্ব অঙ্গে
বহুদিনের দৃশ্য দেখার উৎসাহ তাই
এক জোড়া চোখ নিয়ে এলাম নিজের সঙ্গে...

(*প্রত্যাবর্তনের সময়;* আবুল হাসান)

সব মানুষেরই মনে হয় একটা পরিসীমা থাকে। আমাদের সকল দৈনন্দিন আর পার্থিব জগতের দূরত্বগুলো মাপার জন্য আছে নানান পরিমাপ, আছে নানান দ্রুতগামী আর শ্লথ সব বাহন। জাগতিক সবকিছুই আমরা করি এক পরিসীমার ভেতরে থেকে। শুধু স্মৃতির শহরেই এসব কিছুর বালাই নেই, সেখানে স্থান- কাল- পাত্র সবকিছুই অর্থহীন, পার্থিব সবই মূল্যহীন। একটা মিমি চকলেটের জন্য আক্ষেপও শেয়ার মার্কেটে কোটি টাকা হারানোর বেদনার চেয়ে বেশি হতে পারে। আমরা যতই বড় হতে থাকি, বাস্তব জগৎটা ততই হানা দিতে থাকে আর তার থাবায় দূরে সরে যেতে থাকে এক স্মৃতিময় শহর। কিন্তু তাও স্থানে- অস্থানে নাছোড়বান্দা শৈশব হানা দেয় আর ফিরে ফিরে আসে সেই শহর। চলুন আজ ঘুরে দেখি আমার সেই নগরী, একটা সিটি ট্যুর নিলে আজ মন্দ হয় না, স্মৃতির

শহরে কখনোই যানজট হয় না, আজ দিনটাও মন্দ নয়, এই মেঘ এই বৃষ্টি, এই রোদ, এই গরম, এই ঠাণ্ডা, এই শহরের মানুষজন আছে ভালোই।

আমাদের তেজগাঁকে প্রায় গ্রামই বলা চলে। স্টেশন রোডে বাড়ি মাত্র পাঁচটা। মানুষ মতিঝিলে গেলে বলে টাউনে যাচ্ছি। আর বলবে না- ই বা কেন? এটা পুরোদস্তুর একটা স্টেশন, সাদা সিমেন্টের দেওয়ালে জ্বলজ্বলে কালো অক্ষরে লেখা আছে স্টেশনের নাম। টিটিকে ম্যানেজ করে অনেক দুষ্টু লোকই বিনা টিকেটে টুক করে নেমে যায়, পরের স্টেশনই হচ্ছে কমলাপুর, ওটাই ঢাকার আসল স্টেশন, ওখানে ফাঁকি মারা একটু কঠিনই মনে হয়। একটা বইয়ের দোকান আছে, সেখানে পাওয়া যায় প্রগতির বই আর রাশান ম্যাগাজিন স্পুটনিক। আরও আছে একটা চায়ের দোকান, তাতে টিমটিমে একটা বাতি জ্বলে দিনরাত, পিঁপড়েমাখা শুকনো কিছু বাটারবন আর সস্তা বিস্কুট, এইটুকুই সম্বল। এছাড়াও ভিখিরি, ভাসমান পতিতা, নেশারু, দালাল, তাসের আড্ডা, খোলা নর্দমা, বিশ্বসেরা আরামবাগ রেস্তরাঁ... সব মিলিয়ে জায়গাটা কিন্তু মন্দ নয় একদম, এতকিছু একসাথে আর কোথায় পাবেন?

স্টেশনের হালই বলে দেয় যে এখানে মালদার লোকেরা পদধূলি দেন না, যদিও বেলা- অবেলায় তেজগাঁয় ভিড় লেগেই থাকে। আমাদের তাও গর্বের শেষ নেই, বড় পুরোনো এই উপশহর, আমরা কয়দিন আগেই জপমালা রাণীর গির্জার ৩০০ বছর পূর্তি নিয়ে সপ্তাহব্যাপী উৎসব করেছি। প্রখ্যাত অধ্যাপক মুনতাসির মামুন তাঁর ‘‘স্মৃতি- বিস্মৃতির শহর’’ বইতে তেজগাঁ নিয়ে বলেছেন...

> *১৭৮৯ সালের কোম্পানির এক নথিতে জানা যায়, তেজগাঁয় ইংরেজ কুঠি কাপড় ধোয়ার (মসলিন) জন্য বড় একটি পুকুর খনন করেছিল। মিশনার রেভারেন্ড রবিনসন ১৮৩৯ সালে লিখেছিলেন, ঢাকা হতে ছ’মাইল দূরে তেজগাঁ একটি গ্রাম। ঢাকা থেকে তেজগাঁ যেতে হলে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পেরুতে হয়... সেই জঙ্গল পেরুবার সময় সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয় কারণ বাঘের উৎপাত আছে। তেজগাঁর গীর্জা ‘‘জপমালা রাণীর গীর্জা’’ হিসেবেও পরিচিত। এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পর্তুগীজরা। তাঁরাই ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম যাঁরা প্রচার করেছিলেন খ্রিষ্টান ধর্ম। মোহাম্মদ শামসুল হক বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা ও স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য দেখে এর প্রতিষ্ঠা সময় নির্ণয় করেছেন যা যুক্তিযুক্ত। তিনি এর প্রতিষ্ঠাকাল উল্লেখ করেছেন ১৬৭৭ সাল বলে, যখন শায়েস্তা খান ও পর্তুগীজদের মধ্যে যুদ্ধ ও শান্তিচুক্তি হয়েছিল।*

একটা রিকশা ধরে শহরে ঘুরবেন নাকি একটু? দাঁড়ান, রশিদ ভাইকে বলি। উনি এখন স্থায়ীভাবে স্মৃতির শহরেই থাকেন, আমাকে যাঁরা ভালোবাসতেন তাঁদের মধ্যে উনি একদম সামনের দিকের সারিতেই আছেন। কাজ করেন আমার আব্বার অফিসে... রোগা, গালভাঙা, পরনে একটা সাদা শার্ট আর লুঙ্গি। আমি সাত বছরের বালক, সাথে রশিদ ভাই থাকলে ভালোই হবে।

রিকশা স্টেশনটা ছাড়িয়ে ফার্মগেটে যাওয়ার পথে আমাদের ডাক্তার সাহেবের দেখা পাবেন, ড: অমরচাঁদ রায়, এমবিবিএস, এফসিপিএস (অধ্যয়নরত)। এই পঞ্চাশ বছর বয়সেও উনি এফসিপিএস অধ্যয়ন করেই চলেছেন, পাশ করা আর হয়ে ওঠে নি কস্মিনকালেও। তাতে কী? ওনার অ্যান্টিবায়োটিক খেলে তো রোগ সারে, তাই না? তাছাড়া এমবিবিএস থাকলেই ডাক্তার, আর বাকিগুলো সব ফাউ ডিগ্রি।

রিকশা ফার্মগেট পার হয়ে গুলির বেগে ছুটে চলেছে এয়ারপোর্ট রোড ধরে। ফার্মগেটে আর থামলাম না। আপনাদের তো নিয়ে গিয়েছি ফার্মগেটে, মনে আছে? এখন রশিদ ভাইয়ের হাত ধরে বসে থাকাই শ্রেয়। আপনি যদি সেদিনের ছোকরা হন, তাহলে একটু অবাকই হবেন। এটা ভিআইপি রোড, রিকশা এখন আর চলে না। কিন্তু স্মৃতির শহরে মনে হয়ে ভিআইপিরাও রিকশা চড়তেন, তাই ওখানে রিকশা চলতে কোনো বাধা নেই।

রাস্তার মাঝখানের আইল্যান্ডে কৃষ্ণচূড়া গাছের সারি দেখে অবাক হচ্ছেন? চুপিচুপি একটু ভবিষ্যদ্বাণী করি... এই শহরে এক নতুন শাসক এসেছেন, উনি আর কিছুদিন পরেই এই গাছগুলোকে মৃত্যুদণ্ড দিবেন। তবে জীবননাশের আশঙ্কায় ওরা ভীত নয়, নিঃশঙ্ক চিত্তের চেয়ে আর কিছু বড় সম্পদ নেই, সেটা সেই বিপ্লবীর মতো এই গাছগুলো মনে হয় জানে।

একটু সামনে গেলেই দেখবেন জলাভূমি, দুধারেই। এগুলো মনে হয় ঢাকার বর্জ্য পানি বের করে দেয়, একটু দূরে বেগুনবাড়ি খাল, সেটা আরও বড় জলাধার। আমার ভবিষ্যদ্বাণী হলো, এখানে জলাভূমি ভরাট করে আমরা হোটেল, শপিং মল, অফিস আর রেস্তরাঁ বানাব নিকট ভবিষ্যতেই, আমরা যে আত্মঘাতী বাঙালি, আমাদের ভবিষ্যৎ দেখতে বেশি দূরদৃষ্টি লাগে না। যদি সম্ভব হতো, আমরা মহাশূন্যও মাটি দিয়ে ভরাট করে “বসুন্ধরা- ২” বানাতাম।

কাবাব আর পরোটার গন্ধ নাকে আসছে না? ওটা আসছে দারুল কাবাব থেকে। বাংলামটর আর কয়েক কদম দূরে, এই জায়গা কাবাবের সুরে আর ছন্দে ভরে থাকে দিনরাত। ওদের চিকেন টিক্কা আর পরোটা খেলে পরজন্মেও মনে থাকবে এর কথা। “রায়তা” নামে যে এক বস্তু আছে সেটা তো ওদের কাছ থেকেই আমার শেখা। আশির দশকে ওদের দোকান উঠে যাওয়ার পর থেকে ওরাও আজ শুধুই স্মৃতির শহরেরই বাসিন্দা।

বাংলামটর- পরীবাগ পার হওয়ার সময় কিছু দোকানপাট দেখবেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র খুঁজে লাভ নেই, ওটা এখনো আমাদের সময়ের সবচেয়ে আলোকিত মানুষের স্বপ্নেই আছে। উনি হয়ত এখন ইন্দিরা রোডের বাড়ির ভাড়া নিয়ে দরদাম করছেন, স্বপ্নের যাত্রা শুরু হলো বলে। একটু এগুলেই কিছু দামি সরকারি কলোনি আর তারপরেই আমাদের সবেধন নীলমণি হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল। শেরাটন গ্রুপ ওটা কেনার কথা হয়ত মাত্র ভাবা শুরু করেছে। রেস্তরাঁ কাম বার সাকুরা একদম পাশেই, দীর্ঘদিন ধরে সুখাদ্য আর পানীয় বেচে বেচে ওরা এই তিলোত্তমা শহরের এক প্রতীক হয়ে গিয়েছে। কাছের রমনা পার্কও সমাজবিরোধীদের দখলে যায় নি, ওটাও বেশ পারিবারিক জায়গা, মাঝে মাঝে সপ্তাহান্তে আমাদেরও বেশ ভ্রমণ হয় সেখানে।

শাহবাগের মোড়ে এসেছেন? মোড়ের হাসপাতালটাকে লোকে পিজি হাসপাতাল বলে, ওটার নাম যে এককালে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ হবে সেই ধারণা রাস্তার কোনো লোকেরই নেই। বছর দুয়েক আগে বঙ্গবন্ধুর নিথর দেহ পড়ে ছিল তাঁর স্মৃতিময় দোতলা বাড়ির সিঁড়িঘরে, কাছেই শুয়ে ছিলেন তাঁর অতি প্রিয়জনরা, শুয়ে ছিল আমার থেকে একটু বড় ভয়ার্ত এক বালক। এই নিষ্ঠুর ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তারা তখনো নিজেদের বিপ্লবের নায়ক ভাবছে, ভাবছে জার নিকোলাসকেও তো সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল, রুশ বিপ্লবের নায়করা কি খলনায়ক হয়েছে? আমার শহর সেই গ্লানি বহন করে চলেছে তখনো। শহরে কোথাও বঙ্গবন্ধুর নাম- নিশানা পাওয়া যাবে না। শাহবাগের কাছেই একটা বিলবোর্ডে ঘষে ঘষে ওঠানো হয়েছে শেখ মুজিবকে। ভালোমতো লক্ষ করলে চেনা যায় তাঁকে। মুজিবকে এই শহরে পেতে হলে দৃষ্টি নয়, অন্তর্দৃষ্টি থাকতে হবে, তিনি নির্বাসিত এখান থেকে, পুরোনো ময়লা টাকা ছাড়া আর কোথাও নেই তিনি। নেই তাঁর স্মৃতি বিজড়িত রেসকোর্স, তাঁর বাসভবনে আছে কবরের নির্জনতা, রাষ্ট্রের প্রহরী সেখানে পাহারা দেয় অষ্টপ্রহর। কয়েক বছরের পুরোনো সিনেমার কোর্ট সিনে দেখতে পাবেন জজসাহেবের পেছনটা ঘষটানো, ওখানে মুজিবের ছবি ছিল যে! মানুষকে কি এত সহজে মুছে ফেলা যায়?

রিকশা চলছে এলিফ্যান্ট রোড দিয়ে, কাঁটাবন পেরিয়ে। মনোহারি জিনিসের দোকানটা কী বস্তু সেটা আমার মাথায় ঢুকত না, কিন্তু এলিফ্যান্ট রোডের দোকানগুলো মনে হতো আসলেই মনোহারি জিনিসের দোকান। বিয়ের কুলো, পায়ের জুতো, বিদেশি প্যান্ট, বেল্ট, লাইটার, কী নেই? কে বলবে এই রাস্তায় একসময়ে হাতির যাতায়াত ছিল! আবার তুলে ধরছি "স্মৃতি- বিস্মৃতির শহর" বইয়ের পাতা।

> *ঢাকায় এক সময় হাতির আধিক্য ছিল খুব। সরকারি পিলখানা ঢাকায় থাকাও এর একটি কারণ হতে পারে। নদীতে হাতি গোসল করানোর জন্য নির্দিষ্ট কোনো জায়গা ছিল না। ১৮৬৪ সালে, পৌরসভা স্থাপনের আগে, লেফটেন্যান্ট গভর্নর ঢাকায় এলে, ঢাকা কমিটির সদস্যরা জানিয়েছিলেন, হাতিরা শহরে সৃষ্টি করছে "সিরিয়াস ন্যুইসেন্সের"। এ পরিপ্রেক্ষিতে খুব সম্ভব বিস্তীর্ণ রমনা এলাকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল হাতি চরাবার জন্য। পিলখানা থেকে রমনায় হাতি নেওয়ার জন্য যে পথটি ব্যবহৃত হতো কালক্রমে তা-ই পরিচিতি লাভ করেছিল এলিফ্যান্ট রোড নামে।*

এসে গেছি সায়েন্স ল্যাব, আমার দ্বিতীয় বাসভবন। আমার জন্ম এর থেকে দূরে নয়, দূরে নয় স্কুলের মাঠ, দূরে নয় কলেজের চত্বর, দূরে নয় বড় হওয়ার গল্পগুলোও। এখানে আমি একদম সপ্রতিভ, জলের মধ্যে মাছের লেখাজোখার মতোই সাবলীল আমি। রশিদ ভাইয়ের হাতটা ছেড়ে দিলেও আমি হারিয়ে যাব না। আর হারালেই বা কী, সামনেই দেখতে পাচ্ছি সায়েন্স ল্যাবরেটরি পুলিশ বক্স। টুক করে ঢুকে পড়ে বাসায় ফোন দিয়ে দেবো।

রিকশা কি ধানমন্ডি যাচ্ছে? আমরা তো বলি নি কিছু। স্মৃতির শহরের রিকশাওয়ালারা আবার অন্তর্যামী। ওরা জানে কোথায় যেতে হয়। পার হয়ে গেছি ধানমন্ডি মাঠ, এই দুপুরেও সেখানে খেলা চলছে। আট নম্বর রোড দিয়ে ঢুকে ব্রিজটা পেরুতেই ধানমন্ডি লেক, দুপাশে সবুজ ঘাসের গালিচা। ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে কিছু স্বাস্থ্যপ্রেমী মানুষ। কী আশ্চর্য, আজ রিকশাওয়ালা আমাকে ঘুরিয়ে এনেছে আমার শৈশবের পরিসীমা, আমার সীমাবদ্ধ জগৎটাকে। এই লোক কি পিসি সরকারের কেউ হয় নাকি?

একটুও বাতাস নেই। লেকের পানিতে প্রচুর সাপ আছে। আমি আমার নানার সাথে বেড়াতে যেতাম লেকের ধারে। সাপ দেখে আঁকড়ে ধরতাম তাঁর হাত। উনি অভয় দিতেন, এগুলো নাকি ঢোঁড়া সাপ, কোনো উচ্চবাচ্য নেই ওদের। কথাটা ঠিকই, আজ লেক থেকে উৎখাত হয়েছে ওরা সমূলে। হরলিক্স খাওয়া বাচ্চার মতো স্বাস্থ্যবান সাপ খুঁজে পাওয়া বড় দুষ্কর। অল্প কয়েক বছর আগে

লেকের পাড়ে একটা আধমরা সাপ দেখে আমার রীতিমতো দুঃখ হয়েছিল সেই শৈশবের ভীতিপ্রদ প্রাণীদের জন্য। বেচারারা নির্বিষ ছিল দেখেই কি নির্বংশ হলো?

ফিরবেন বাসায় নাকি থেকে যাবেন লেকের পাড়ে? আপনার ইচ্ছে। তবে শৈশবের শব্দ, গন্ধ আর ছবি বুকে মেখে নিয়ে ফিরে আসতেই হবে এই পোড়া পোড়া গন্ধওয়ালা বাস্তবে, ফিরলেই ঘিরে ধরবে নানান ধান্ধা আর যাবতীয় মিথ্যে সব কাজ। কিন্তু এরপরও বুকের মাঝে যেই চিনচিনে ব্যথাটা লাগছে, সেটা কিন্তু ব্যথা নয়, এক টুকরো আনন্দ। ওইখানটাতেই আছে আপনার স্মৃতির শহর। শীতের পাতাঝরা দিন অথবা বসন্তের ঝলমলে সকাল, অথবা ঝমঝমে বর্ষা সবই পাবেন দশ মিনিটের সফরে, বেড়ানোর এমন জায়গা কি আর কোথাও আছে? কী আশ্চর্য স্মৃতির শহর!

স্মৃতির শহর - ১২:
দুই পৃথিবী

খেলাঘর পাতা আছে এই এখানে,
স্বপ্নের ঝিকিমিকি আঁকা যেখানে।
এখানে রাতের ছায়া ঘুমের নগর,
চোখের পাতায় ঘুম ঝরে ঝরঝর।
এইখানে খেলাঘর পাতা আমাদের,
আকাশের নীল রং ছাউনিতে এর।
পরীদের ডানা দিয়ে তৈরি দেয়াল,
প্রজাপতি রং মাখা জানালার জাল।
তারা ঝিকিমিকি পথ ঘুমের দেশের,
এইখানে খেলাঘর পাতা আমাদের।

(রূপকথা; আহসান হাবীব)

ধুদ ১টা ৩/ -
মুরঘি ১টা ১৫/ -
আঠা ১ সের...

আম্মা চোখ কুঁচকে আলোর লেখা বাজারের হিসেব পড়তে থাকেন। উর্ধ্বগামী খরচের চেয়ে বানান ভুলের প্রাবল্যই হয়ত তাঁকে বিচলিত করে বেশি। যেকোনো ভুল বানান সংশোধন করাটা তাঁর প্রায় স্বভাবের অন্তর্গত হয়ে গেছে। তিনি ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভা। ইংরেজি, বাংলা, গণিত, ভূগোল, সাহিত্য সব বিষয়েই তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। একাধিক বিদেশি ডিগ্রি কুক্ষিগত করেছেন অনায়াস দক্ষতায়, তবুও তাঁকে দিনের শেষে বাজারের হিসেব মেলাতে হিমশিম খেতে হয়, সংসারের অর্থনীতি চিন্তায় দিনাতিপাত করতে হয় অহর্নিশ। এই পার্থিব সংসারের চাপে অচিন পাখির মতোই উচ্চাশাগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেছে তাঁর।

আমি সকালে ঘুম ঘুম চোখে দেখি তিনি অফিসে যাবার জন্য প্রস্তুত। দুপুরে অফিস থেকে ফিরে প্রিয় কোনো বই হাতে একটু বিশ্রাম, রাতে আমাদের পড়াশুনার তদারকি আর সংসারের যাবতীয় হিসেবনিকেশ। দামি কোনোকিছু কিনতে গেলেই পিছিয়ে এসেছেন, বেশিদিন আর বাঁচব না, পয়সা নষ্ট করে কী হবে? নশ্বরতার এই চিন্তায় চিন্তায় কিছুই আর ঠিক কেনা হয়ে ওঠে নি, দেখতে দেখতে পুরোনো আসবাবপত্রে বাসা হয়ে গিয়েছে মিউজিয়াম। বেড়ানো অথবা ভ্যাকেশন? অফিসের ট্যুর ছাড়া কখনো দেখি নি তাঁকে শহরের চৌহদ্দি পার হতে। এভাবেই অর্থমন্ত্রীত্ব করতে করতে কেটে গেছে প্রায় পুরোটা জীবন।

আমার বাবার বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতায় কিছুটা সীমাবদ্ধতা ছিল, যদিও উনার সাধুভাষায় লিখিত গদ্য ছিল অতি প্রাঞ্জল। ফোনে আমাদের বাসার আসার নির্দেশনা দিতে গেলে আব্বা প্রায়ই বলতেন...

"জ্বি জ্বি... আমাদের বাসাটা তেজগাঁ স্টেশনের একদম উপরেই... হাড়ভাঙার দোকানের পেছনেই..."

আব্বার এই "ডিরেকশন" শুনে আম্মার বিরক্তি বেশ চরমে উঠত। স্টেশনের উপরে কীভাবে মানুষের বাসা হয়? হাড়ভাঙার দোকান কি প্যারিসের আইফেল টাওয়ার যে সবাই চিনে ফেলবে? যেহেতু আব্বা খুব গুছিয়ে কোনোকিছু ব্যাখ্যা করতে পারতেন না, তাই আমাদের বাসার পররাষ্ট্র ও গণযোগাযোগ দফতরও আমার মায়ের দখলে। কিন্তু আমরা কেউ অসুখে পড়লে এইসব মন্ত্রীত্ব বাদ দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদে হঠাৎ মায়ের আবির্ভাব, চিকেন স্যুপ, পোলাওয়ের চালের নরম ভাত, অল্প মসলা দেওয়া ঝোল... যদিও আমার খেতে ইচ্ছে করত না তখন... কিন্তু শাস্ত্রে নাকি আছে ফিড আ কোল্ড অ্যান্ড স্টার্ভ আ ফিভার... আমি ভাবতাম আমার তো জ্বর, তাহলে তো না খেয়ে থাকার কথা, কিন্তু কেন জানি আমার অসুখটা সব সময়ই "কোল্ডই" হতো, তাই জোর করেই খেতে হতো। তাছাড়া

জীবাণুর সাথে যুদ্ধ করতে গেলে শরীরে বল লাগবে না? এখন নিজের বুদ্ধিতেই অসুস্থ শরীরে খাবার গলধঃকরণ করি কিন্তু জ্বরের ঘোরে যেন সেই অমৃতই খুঁজে বেড়াই।

আম্মার একমাত্র বিলাসিতা ছিল বই পড়া। দুপুরে বা রাতে বই না পড়লে ঘুমই আসতে চাইত না। প্রায়ই আম্মা আমাদের গল্প অনুবাদ করে শোনাতেন, ঘুম ঘুম দুপুরে শার্লক হোমসের গল্প শুনতে শুনতে চোখের সামনে দেখতে পেতাম বেকার স্ট্রিটের বৈঠকখানা আর পরক্ষণেই আমাদের বারান্দার রোদ্দুর আর পুকুরের ধারের নারিকেল গাছের সারির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হতো ইংল্যান্ডের চেয়ে ঢের ভালো আমাদের এই তেজগাঁ, কী সুন্দর এবং শান্তিময়, একটা জীবন অনায়াসেই কাটিয়ে দেওয়া যায় আমাদের এই ২৯ নম্বর বাসভবনে। বহু বহু বছর পরে বেকার স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে কেন যেন সেই দুপুরবেলার গল্পই ফিরে এসেছিল, শার্লক হোমস নন, মায়ের মুখে শোনা অসাধারণ গল্পগুলোই ঠেলেঠুলে সরিয়ে দিলো যাবতীয় সাধারণ কথামালা। শুধু অনুবাদ নয়, আম্মা নিজেও প্রচুর গল্প তৈরি করতেন, কোনো কোনো গল্পে তিনি নিজেই নায়িকা, এসেছেন পরীদের দেশ থেকে, কাজ শেষ হলে চলে যাবেন আবারো সেই মুলুকে, তাঁর পায়ের নিচের গোলাপি রঙ কালচে হয়ে যাচ্ছে আমাদের এই ইটপাথরের ময়লা দুনিয়াতে এসে। এই প্রামাণ্য দলিল দেখে শৈশবে মন বিষাদগ্রস্ত হয়েছিল, অর্ধেক জীবন শেষ করে সেই বিষাদ আজও ডানা মেলে, বেড়েই চলেছে যে সেই মালিন্য আমাদের এই দুষ্ট পৃথিবীতে এসে!

শৈশবে আমার ছিল ব্যাপক ভূতের ভয়। রাতে বাসায় জ্বলত অনুজ্জ্বল হলুদ রঙের চল্লিশ পাওয়ারের বাতি, তাতে মনে হয় আলোর চেয়ে অন্ধকারটাই জোরদার হতো বেশি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে দেখা যেত একটু দূরের গির্জার সাথে লাগোয়া কবরস্থানের টিমটিমে বাতি। অনেক পুরোনো সেই কবরগুলো, ভূত হওয়ার জন্য অনেক সময় পেয়েছেন উনারা। এটা আমি নিশ্চিত ছিলাম যে তেনারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন পাড়াময়... রাতে বাথরুমের বন্ধ কল দিয়ে যে টিপটিপ করে পানি পড়ে, তাতেও উনাদের হাত আছে নিশ্চয়ই। রাতে আমি ভয়ার্ত গলায় আম্মাকে জিজ্ঞেস করলে উনি অভয় দিতেন ওইগুলো নাকি ছোটখাটো ভূত... ভদ্র স্বভাব... কারো কোনো ক্ষতি করে না।

ভূত বলে কিছু নেই, এটা কেন বলেন নি, এই প্রশ্নের উত্তর নেই। তবে ওইসব নিরীহ ভূতগুলো আসলেই কোনো ক্ষতি করত না, শুধু শৈশবকে একটু বর্ণাঢ্য করার বিনোদনমূলক দায়িত্ব ছিল ওদের। আমরা ফ্ল্যাট-ট্যাট তৈরি করে তাড়িয়ে দিয়েছি ওদেরকে, আজকের এই শহরে মানুষ ধারণ করাই কঠিন, ভূত তো দূরের কথা!

আমি ওই পৃথিবী ছেড়ে এসেছি অনেকদিন। যেই পৃথিবীতে এখন আমার বাস, সেটা কল্পনা থেকে দূরে, পরীদের থেকে দূরে, দুপুরবেলা শোনা গল্প থেকে দূরে, জ্বরের ঘোরে ভাত খাবার অনিচ্ছা থেকে দূরে, ভালো ভালো সব ভূতদের থেকে দূরে, সন্ধ্যার মুখে তেজগাঁর বাসার ছাদে বসে রেলের শব্দ আর পাখিদের ঘরে ফেরা থেকে দূরে, কামরাঙা গাছে বসা টিয়ে পাখি থেকে দূরে, আমার পোষা কুকুর "জো"র থেকে দূরে। যেই জগতে আমার বেড়ে ওঠা, যেই জগৎটা আমার একান্তই নিজের ছিল, সেই শৈশব থেকে বহু বহু দূরের এক পৃথিবীতে আমার বাস।

এখানে কল্পনা নেই বরং আছে ঘোরতর বাস্তব, পরীদের আনাগোনা নেই, নেই গল্প শোনার দুপুর, আছে বোকাবাক্সের বোকা বোকা গল্পকথা। বিনোদিত করার মতো ভূত নেই বরং আছে বিকট সব হরর ফিল্ম, নেই শেষ রাতের রেলগাড়ির শব্দ, নেই সবুজ রঙের গাছে আরও সবুজ পাখি, বরং আছে দাঁড়বন্দি ডানার কষ্টময় ঝাপটানি। আর নেই আমার সেই বিস্ময়কর জগতের সূত্রধর, আমার মা। কর্কট রোগসহ নানান ব্যাধি তাঁকে জর্জরিত করেছে, আর বিমর্ষ ও ব্যথিত করেছে আমাকে।

আজ আমরা দুই পৃথিবীর বাসিন্দা, ভৌগোলিক দূরত্বের বাইরেও এই দুই জগতের দূরত্ব যেন প্রায় অনতিক্রম্য। এখান থেকে সেই জগতে ফেরাটা অসম্ভব। সেই দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে শুধুই স্মৃতির শহর, বিনা টিকেটে, বিনা খরচে, বিনা বাধায় সেই জগতে প্রবেশ করা যায়, এইটুকু আছে বলেই আমার সেই পৃথিবীটা এখনো হারিয়ে যায় নি। স্মৃতির শহর আছে বলেই বর্তমান পৃথিবীটাকে এখনো মায়াময় লাগে।

বেঁচে থাকুক আমার এক ফোঁটা স্মৃতির শহর!

স্মৃতির শহর - ১৩:
সেইসব রোদ্দুর

আমরা কেউ মাস্টার হতে চেয়েছিলাম, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল।
অমলকান্তি সে সব কিছু হতে চায়নি।
সে রোদ্দুর হতে চেয়েছিল!
ক্ষান্তবর্ষণে কাক ডাকা বিকেলের সেই লাজুক রোদ্দুর,
জাম আর জামফলের পাতায়
যা নাকি অল্প একটু হাসির মতন লেগে থাকে।

(*অমলকান্তি;* নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

"এই হনুমান স্টুপিড, তোরা দুইটা বেঞ্চের উপর দাঁড়া"... আতাহার হোসেন স্যার আদেশ করলেন আমাকে আর পাপুকে। আমরা ক্লাস ফোরের বালক, পেছনের বেঞ্চে বসে কথা বলছিলাম। ধরা পড়লে শাস্তি পেতে হয়, তাই বিরস মুখে আমরা বেঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে যাই। বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে যেন এক নতুন জগতের সন্ধান মিলল। একঝাঁক বিস্ময় নিয়ে দেখলাম দূরে ঢাকা কলেজের মাঠের পেছনে একটা রুপালি রঙের পুকুর।

"পাপু দেখ দেখ... একটা পুকুর..."

"কেন, তুই জানতি না? ওটার মাঝখানে একটা শেকল আছে, সাঁতরে নেমে বেশিদূর গেলে..."

“এই স্টুপিড দুইটা... তোরা আবার বকর বকর...” স্যারের গর্জনে আমার আর জানা হয় না। শেকলের রহস্য রহস্যই থেকে যায়। আমাদের ক্লাস ওয়ান থেকে থ্রি ছিল ল্যাবরেটরি স্কুলের একতলায়, দোতলায় এই প্রথমবার ক্লাস করছি আমরা। অপার বিস্ময় নিয়ে যেন এক অজানা পৃথিবী দেখছি। দোতলার ক্লাসের জানালা দিয়ে স্কুলের মাঠে মেঘের ছায়া দেখে মুগ্ধ হই, তেমনি অবাক হই গ্রীষ্মের বা রোজার ছুটির পরে স্কুলের মাঠভর্তি সাদা কাশফুল দেখে।

স্যার চলে যেতেই জুনায়েদ উঠে দাঁড়ায়, ক্লাসের সামনে এসে ঘোষণা দেয় যে সে একটা চুটকি বলবে।

“এই শোন... একটা লোক হাগতে বসছে... হা হা হা... লোকটা হচ্ছে আতাহার হোসেন স্যার...”

এই চুটকি শুনে আমাদের হাসতে হাসতে পেটে প্রায় খিল ধরে যায়। আমাদের সেই সময়ে অল্প বয়স থেকে খারাপ কথার চর্চা হতো, এতে নাকি মনের চাপ কমে যায়! আমরা যুদ্ধের পরের প্রজন্ম, কারো ঘরেই তেমন প্রাচুর্য নেই, দুর্ভিক্ষ আর সামরিক শাসন দেখে দ্রুত বড় হচ্ছি, মাসের শেষে সবার বাবারই পকেট প্রায় ফাঁকা, শৈশবেই রেশনের দোকানে লাইন দিতে হতো অনেককেই।

আমাদের প্রিয় স্বদেশ তখন উদ্ভট উটের পিঠে চড়ে এক আজব দেশে যাচ্ছে। খেলার মাঠে দৌড় দেওয়া আর আজগুবি সব গল্প, এটাই সবচেয়ে বড় বিনোদন সেই সময়। তবে এই বিনোদনকে অতিক্রম করার মতো অন্যকিছু আজও তৈরি হয় নি। পড়ালেখাতে অধিকাংশের অবস্থাই শোচনীয়, পড়া জিজ্ঞেস করলে অনেকের মুখেই নির্ভেজাল বিস্ময়ের দেখা মিলত। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর “অমলকান্তি” কবিতার এই কয়টা লাইন পড়লেই আমার শৈশবের বন্ধুদের কথা মনে পড়ে যায়।

অমলকান্তি আমার বন্ধু,
ইস্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়তাম।
রোজ দেরি করে ক্লাসে আসত, পড়া পারতো না,
শব্দরূপ জিজ্ঞেস করলে
এমন অবাক হয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতো যে
দেখে ভারী কষ্ট হতো আমাদের।

তবে অমলকান্তিদের ভিড়ে ভয়াবহ জ্ঞানী ছেলেরাও আছে কিছু, যাদের জন্য এই স্কুলটার অনেক সুনাম ছিল একসময়।

পড়া ধরলে আমাদের একেকজনের একেক রকম অভিব্যক্তি দেখা যেত, যেটা বড় হয়ে আমাদের আড্ডায় বিনোদনের ব্যাপার ছিল। অমিকে পড়া ধরলে, ও স্যারকে প্রশ্নটা আরেকটু বিশদ করে বলার জন্য অনুরোধ করত। স্যার বুঝিয়ে বললে ও জানাত যে ওর উত্তর জানা নেই, এটা করলে নাকি মারটা কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যায়। আজিজকে পড়া ধরলে বিনা উসকানিতে ও হাউমাউ করে কাঁদত। পাপু একবার স্যারকে পড়া ধরার পরে বলেছিল, যেই শাস্তি আপনি দেবেন আমাকে (ব্যাঙ হয়ে কান ধরা), সেটা স্যার আমি বাসায় প্র্যাকটিস করে এসেছি। অতনু টপাটপ ফার্স্ট হয়ে যেত, পড়ার উত্তরও দিত নির্দ্বিধায়। কিন্তু একটু বড় হওয়ার পরে ও আর আমি একইসঙ্গে কান ধরে উঠবস করেছি, আনোয়ারুল করিম স্যারের সৌজন্যে, সঙ্গদোষে লোহাও নাকি ভাসে।

আমার বন্ধুদের মধ্যে আরশাদ ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। অসাধারণ রসবোধ আর পুরোনো ঢাকার অশ্লীল গালিগালাজ দিয়ে সে জমিয়ে রাখত চারপাশ। গালাগালির পাশাপাশি সিগারেট খাওয়ায় অতি অল্প বয়সেই সে দক্ষতা লাভ করে। আপনারা নিশ্চয়ই ওর উন্নতির কার্ভটা দেখছেন? এই তিনটি বিষয়ে আমার উৎসাহের পেছনেও ওর অবদান রয়ে গেছে। মানুষের বিপদে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে ঝাঁপিয়ে পড়া অকৃতদার এই মানুষটাকে নিয়ে মনে হয় এক মহাকাব্য লেখা যাবে।

আরশাদের পরেই আসে লোদীর নাম। গালাগালে ওকে রানার- আপ বলা যায়। এছাড়া অশ্লীল ছড়া- গান, স্যারদের নকল করে দেখানো, এই সমস্ত বিষয়ে সে ছিল সিদ্ধহস্ত। অফিস পাড়াতে এই ছিমছাম, মোটাসোটা মাঝবয়সি ভদ্রলোককে দেখেও থাকতে পারেন আপনারা, সৌজন্যের আড়ালে শৈশবের বিচ্ছু ছেলেটা চাপা পড়ে গেছে কোথায় যেন।

স্কুলের সামনে একটা ঝকমকে রিকশা দেখতে পাবেন। ওটার পেছনে বড় বড় লাল হরফে লেখা আছে "প্রাইভেট"। ঢাকার সোওয়ারি ঘাট থেকে আমাদের বন্ধু আজিজ ওটা চেপে রোজ স্কুলে আসে। ওটার গায়ের ঝালরগুলো প্রায় নতুনের মতো, সিটের নিচে একটা বাহারি রেডিও ফিট করা আছে, সামনে স্লাইডিং গ্লাস উইন্ডো। আমি আমেরিকাতে এসে "ফুললি লোডেড" গাড়ি দেখার পর বুঝতে পেরেছি যে আজিজের রিকশাটা "ফুললি লোডেড" ছিল। তবে রিকশাওয়ালা অতি বজ্জাত ছিল, আজিজ ছাড়া আর কেউই

চড়তে পারত না সেই রিকশাতে। আমার এখনো গোপন বাসনা, ওই রকম একটা রিকশা কেনা। নিজে চালালে মেদও কিছু কমতে পারে।

আমাদের প্রথম দুটো শ্রেণীতে ছিল মাত্র চারটা পিরিয়ড। স্কুলে টিফিন দিত, সেই পরোটা আর ভাজির স্বাদ আমি আজও ভুলতে পারি নি। একটু বড় হওয়ার পর আমরা টিফিন পিরিয়ডে দল বেঁধে বাইরে খেতে যেতাম। স্কুলের উলটো পাশেই ছিল ‘‘চিটাগাং রেস্তরাঁ’’ আর ‘‘ঢাকা স্ন্যাক্স’’। চিটাগাং হোটেলে গেলে আমরা খেতাম কিমা পরোটা, সত্যিকারের কিমার তৈরি, রীতিমতো মোটাসোটা সাইজ ছিল ওদের। এর সাথে দিত সামান্য সালাদ। অতি দ্রুত শেষ করতে হতো, শকুনের মতো বন্ধুবান্ধব আমার, কারো আগে শেষ হলে সে হামলা করবেই। কালক্রমে আমি নিজেও এক শকুনে পরিণত হয়েছি, এখন আমার খাওয়া আগে শেষ হলেই সেটা অন্যের জন্য ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

একটু বড় হয়ে আমরা টিফিনের সময় আরও দূরে যাওয়া শুরু করি। সায়েন্স ল্যাবের মোড়ে ছিল মালঞ্চ স্ন্যাক্স, ওদের কলিজা সিঙ্গাড়া আর সমুচা অমৃতের মতো লাগতে শুরু করল আমাদের কাছে। আর মাঝেসাঝে ধানমন্ডি পাঁচ নম্বর রোডের মহানগরী সবজি ঘরে কোন আইসক্রিম খেতে যেতাম আমরা। কোন আইসক্রিম ঢাকাতে নতুন এসেছে তখন, আমার মনে হতো এই আইসক্রিমের আবিষ্কর্তাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত।

দূরদূরান্তে যাবার কারণে টিফিন টাইম পার হওয়ার পর স্কুলে ঢুকতাম আমরা। দুই একজন করে করে লুকিয়ে ক্লাসে ঢুকতে হতো, এটাই ছিল বিরাট অ্যাডভেঞ্চার। তবে ব্যাপারটা হেড স্যারের নজরে আসায় উনি একদিন সবাইকে হাতেনাতে ধরেন এবং শাস্তির ব্যবস্থা করেন। তবে ততদিনে শাস্তিতে আর কাজ হতো না।

আমরা প্রায় সবাই বই পড়তাম, টেলিভিশনের চ্যানেল ছিল মাত্র একটা, সেটাই দেখা হতো। সবার মানসিকতাই ছিল কাছাকাছি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের। সবারই প্রিয় বইগুলো বের হয়েছে সেবা প্রকাশনী থেকে, নাইজারের বাঁকে, মরুশহর অথবা কার্পেথিয়ান ক্যাসেল নিয়ে আলোচনা করে ক্লাসের ভেতর ও বাইরেটা কেটে যেত। একবার কয়েক বন্ধু মিলে দল বেঁধে গিয়েছিলাম সেগুনবাগিচার সেবা প্রকাশনীতে। স্মৃতির শহরে কাজীদার চেয়ে উজ্জ্বল উপস্থিতি খুব কম মানুষেরই আছে।

ক্লাস টেনে ওঠার পর থেকে আমাদের কনসার্টে যাতায়াত শুরু হয়। ঢাকায় তখন ব্যান্ড সংগীত তরুণদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয়। আমাদের প্রজন্ম সেই উত্তাপের বাইরে নয়। আমাদের বন্ধু টিপু তখন সদ্য মাস্তানিতে হাত পাকাচ্ছে, ওর জীবনের লক্ষ্যও স্থির করেছে... "ডেরাগ ডিলার" হতে চায় সে। কনসার্টে মারামারি করাটা ওর "জব ডেসক্রিপশন"- এর অন্তর্গত মনে করে সে। "গ্যাঞ্জাইম্যা" না হলে ঠিক "কুল" হয় না ব্যাপারস্যাপার। দুঃখের বিষয় প্রায় প্রতিটি কনসার্ট টিপুর একদফা প্রহার হজমের মধ্যে দিয়ে শেষ হতো। বড় হয়ে টিপু একই ভুল পথে হাঁটতে থাকে এবং আজ থেকে বছর দশেক আগে আমেরিকার এক জেলের সেলে নিঃসঙ্গ মৃত্যুবরণ করে সে। বিশালদেহী প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর হাসিখুশি এই ছেলেটার জীবনটা শেষ হয় শুধুই ভুল পথে হেঁটে হেঁটে।

আমাদের আরেকটা বিশুদ্ধ বিনোদন ছিল ফুটবল খেলা। স্কুলের মাঠ থেকে ঢাকা স্টেডিয়ামে সর্বত্রই তখন ফুটবলের জয়জয়কার। আবাহনী আর মোহামেডানের খেলাতে গ্যালারি উপচে পড়ে ভিড়ে। দুজনেই সমান সমান। আমাদের প্রিয় আবাহনীতে তখন সালাহউদ্দীন, চুন্নু, আসলামদের স্বর্ণযুগ চলছে। ভারতের গোলরক্ষক অতনু ভট্টাচার্যকে ডি- বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া আচমকা শটে পরাভূত করেছেন আসলাম। উনি সম্প্রতি নিজের এই আচমকা গোল দেওয়ার অভ্যেসটাকে ফ্যাবিয়ানোর সাথে তুলনা করাতে অনেক হাসাহাসি হতে দেখেছি, কিন্তু আমার মনে উনার সেই গোল ভাসছিল বলে কথাটাকে আর বড়াইয়ের মতো লাগে নি। আবাহনী ইরাক থেকে বিশ্বকাপ তারকা খেলোয়াড়দের এনেও হেরে গেছে মোহামেডানের কাছে, দুবার এগিয়েও জিততে পারে নি। ক্লাস শুরুর আগে এই নিয়ে দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে বচসা হয়। খেলায় যে- ই জিতুক না কেন, কোনো অজানা কারণে বচসার পরে আমাদের বন্ধু আবিদকে আচ্ছা করে ধোলাই দেওয়া হতো, গুলগল্পের কারিগর আবিদের ঘড়িতে নাকি অক্সিজেন ঢোকানো আছে, সে মার খেয়ে শ্বাস নেয় সেখান থেকে। আমরা স্কুল থেকে বাড়িতে ফেরার সময় রাস্তায় মোড়ে মোড়ে ওড়া আবাহনীর নীল আর মোহামেডানের সাদা- কালো পতাকাগুলো গুনতাম, যারটা বেশি তারাই নাকি জেতে... কলরবময় দিনগুলো স্বপ্নের মতো কেটে যায় শৈশব আর কৈশোরের বারান্দায়।

সেই বালকদের কোলাহলগুলো যেন স্বপ্নের ওপার থেকে ভেসে আসে কোনো কোনো সকালে, ওদের সবার চোখে দেখতে পাই বিস্ময়, পৃথিবীর পাঠশালায় এই সময়টাই যেন আশ্চর্য হওয়ার সময়। এরপরে পৃথিবীকে দেখার সেই চোখটা কোথায় যেন হারিয়ে যায়। এই বালকরা আজ সবাই এখন ধূসর ভদ্রলোক, সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষ, নানান সামাজিকতার নিচে চাপা পড়ে গেছে শৈশব। তবুও

হয়ত নানান কাজের ফাঁকে জীবনের ধুলোময়লাগুলো ঝেড়ে ফেলে এরাও ঘুরে আসে অনেক দূরের সেই শহরে, সবার অলক্ষ্যে... দীর্ঘশ্বাস বুকে নিয়ে দূর থেকে দেখে বালকবেলার কোলাহল। এ বড় মোহনীয় দৃশ্য!

[উৎসর্গ: অকাল প্রয়াত বন্ধু মাহমুদুল হক টিপুর পূণ্য স্মৃতিতে]

স্মৃতির শহর - ১৪:
বালকবেলা

আমি কোনো আগন্তুক নই
আসমানের তারা সাক্ষী, সাক্ষী এই জারুল জামরুল, সাক্ষী পুবের পুকুর...
এই খর রৌদ্র, জলজ বাতাস, মেঘ ক্লান্ত বিকেলের পাখিরা আমাকে চেনে।
দু'পাশে ধানের ক্ষেতে সরু পথ, সামনে ধূ ধূ নদীর কিনার আমার অস্তিত্বে গাঁথা।
আমি এই উধাও নদীর মুগ্ধ এক অবোধ বালক।

(*আমি কোনো আগন্তুক নই;* আহসান হাবীব)

দিনটা এখনো শুরু করি নি। আমার বাসার কাজের টেবিলে সকালের রোদ্দুর এসে পড়েছে, জানালা খুলতেই একঝাঁক ঠাণ্ডা বাতাস মুখে এসে পড়ে, বাইরের মাঠে স্বাস্থ্যপ্রেমীদের ছোটাছুটি, পাখিদের ডাকাডাকি, ফুলের সৌরভ। সর্বত্রই দিন শুরুর প্রস্তুতি। ওরা সবাই মিলে ডেকে আনে আমার বালকবেলা, সেই ঊনত্রিশ নম্বর বাড়িতে আমি পৌঁছে যাই এক নিমেষে।

স্মৃতির শহরের দিনগুলো ঝকঝকে হয়, মলিনতা ঝেড়ে ওরা সর্বদাই তরতাজা। ওখানে আব্বা রীতিমতো যুবক পুরুষ, সকালে গুনগুন করে গান করেন, নাস্তার টেবিলে টুকটাক আলাপ করেন আর অজান্তেই জীবনদর্শন ঢুকিয়ে দেন মাথার মধ্যে। রান্নাঘর থেকে রেশমি ধোঁয়া উড়ছে, মিষ্টি গন্ধটা ফুলের নয়, মিষ্টি কুমড়া নিয়ে তৈরি সব্জির। আর ছ্যাঁৎছ্যাঁৎ শব্দটাতেও ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ওটা পরোটা ভাজার শব্দ। দূরে কোথাও সাগর সেন গাইছেন "তুমি এপার- ওপার করো কে গো ওগো খেয়ার নেয়ে...", এই সকালের

চলচ্চিত্রে ব্যাকগ্রাউন্ড সংগীতের মতো ছড়িয়ে পড়ে তাঁর অপূর্ব কণ্ঠের ব্যাকুলতা। এই আশ্চর্য ভোরবেলাটা যেন বিস্মৃতির আড়াল থেকে উঠিয়ে আনে একমুঠো স্মৃতির শহর। সেই শহরে আর ফেরা হয় না, শুধু তার অপার্থিব সৌন্দর্যের জলছবি দেখি।

বারান্দায় বসে আছে বোকা চেহারার হাঁ-করা একটা কাক, যেটাকে আমার বড় ভাই ডাকেন "স্টুপিড কাক"। উনিও উঠে পড়েছেন। একটু পরেই বাথরুম থেকে বেরুবেন, লম্বা চুল আঁচড়ে। আব্বার সাথে একদফা ঝগড়াও হয়ে যেতে পারে নানান বিষয়টিষয় নিয়ে। উচ্চস্বরে কথা বলাটা আমাদের সবার জন্মগত ত্রুটি। আমাদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে করা আলোচনাও ঝগড়া বলে মনে হতে পারে। টিভিতে সকালের খবর হচ্ছে, রাষ্ট্রপতির গতকালের দিনলিপি দেখছি, উনিও এখন হয়ত একটু পরেই রেডি হয়ে আজকের শ্যুটিংয়ে বের হবেন। আচ্ছা ওনাদের কি ভালো লাগে এই বাক্স দখল করে বসে থাকতে?

কাকডাকা ভোরে উঠে আমার মেজ ভাই পড়তে বসেছেন। ফিটফাট, রুটিন মেনে জীবনযাপন করেন সেই শৈশব থেকেই। তাঁর উপর স্কুলের স্যারেরা খুবই প্রসন্ন, হয়ত মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করবেন। উনিও এসে বসেছেন নাস্তার টেবিলে। এসে গেছে আজকের খবরের কাগজ। সেখানে আছে মিথ্যে প্রেসনোটসহ আরও ঝুরি ঝুরি রাষ্ট্রীয় মিথ্যেভাষণ। আমরা সবাই পয়সা খরচ করে মিথ্যে কথা পড়ি, শুনি এবং দেখি। আম্মাও এসে গেছেন নাস্তার টেবিলে, বাজারের ফর্দ রেডি, আমাদের খাইয়েই আলো ছুটবে কারওয়ান বাজারে।

আমাদের আলোচনার বিষয় হয় রাজনীতি অথবা রসাতলে যেতে থাকা এই দেশ অথবা তেজগাঁ স্টেশন রোডের অধঃপতন। দেশ-কাল-সমাজ সর্বত্রই এক পচনশীল চিত্র, যা হয়ত আজও রয়ে গেছে অপরিবর্তনীয়। এর থেকে আমাদের মুক্তি কীভাবে হবে? সমাজতন্ত্র? গণতন্ত্র? নাকি অন্য কিছু? কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর কোনোদিনও আর জানা হয় না।

আমিও আছি সেই আলোচনায়, হয়ত শ্রোতার বেশে। হয়ত স্কুল কামাইয়ের নতুন অজুহাত খুঁজছি, বগলের নিচে রসুন দিলে কোনো কাজ হয় না, সেটা যে-ই বলুক না কেন। রেডি আছে "চারমূর্তির অভিযান", সবাই চলে গেলে আমি টেনিদার সাথে ডুয়ার্সের জঙ্গলে যাব। যাবার জায়গার অভাব নেই, সূর্যদেবের বন্দিদের একটু পরেই ভাজা হবে, টিনটিনের এইবার খবর আছে! নেতাজী সুভাষ বোস কি পালাতে পারবেন গোয়েন্দা আর পুলিশের চোখ এড়িয়ে? অশ্লীলতার দায়ে নিষিদ্ধ বই "রাত ভ'রে বৃষ্টি" পড়ে নেব একটুখানি, নিষিদ্ধ জিনিসের মজাই আলাদা। আবাহনী কেনই বা ইস্টএন্ডের মতো দলের সাথে ড্র করে পয়েন্ট হারায়?

বাসায় থাকলে দিনগুলো অনেক অনে- - ক লম্বা মনে হয়। গল্পের বই, পাড়া বেড়ানো, আমার পোষা কুকুর ‘‘জো’’র সাথে খেলা করার পরেও অনেক সময় রয়ে যায়। আচ্ছা, স্কুলে গেলে এত তাড়াতাড়ি সময় কেটে যায় কেন? পুরো স্কুল জীবনটাই মনে হয় হুস করে কেটে গেল, এক লহমায়।

স্কুলে গেলেও মন্দ হয় না আজ, পড়াশুনা শিকেয় উঠেছে অনেকদিন। পড়াশুনাটা ওখানে মুখ্য নয়, ওখানেও আছে একরাশ আনন্দের ভাণ্ডার। তবে মনের এক কোণে পড়া নিয়ে ভয়ও আছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে খবরের কাগজে এইরকম অনেক বিজ্ঞপ্তি আসত...

বাবা সুমন, তুমি যেখানেই থাকো ফিরে এসো। তোমার চিন্তায় তোমার মা শয্যাশায়ী। তোমাকে বাসায় কেউ কিছু বলবে না। মাধ্যমিক পরীক্ষার পর সুমন ছেলেটা ঢাকার গোপীবাগের বাসা থেকে হারিয়ে গেছে, কোনো সহৃদয় ব্যক্তি তার সন্ধান পেলে... সুমন বাংলায় কথা বলে।

আমি আতঙ্ক নিয়ে এইগুলো পড়ি, হয়ত ভবিষ্যতে কোনো একদিন আমার জন্য এরকম বিজ্ঞপ্তি আসবে পত্রিকাতে। সেই ভয়েই কি একদিন পড়তে বসে গেলাম?

আজ এই সকালটা কেন যেন বিস্মৃতির অতল থেকে ডেকে আনে আমার ফুটবল খেলার মাঠ, সকালবেলার তাড়াহুড়া, দুপুরবেলার ক্লান্তি, বিকেলের হট্টগোলগুলো। আর সবাইকে পেছনে ফেলে সামনে চলে আসে বালক এক - সালাহউদ্দীনের মতো ফুটবলার হতে পারে সে, হতে পারে বৈমানিক, হতে পারে আইসক্রিমওয়ালা, হতে পারে কবি, তার স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরা পায়ে ধুলো মাখা, চোখ তার চকচক করছে আবিষ্কারের নেশায়, চুলগুলো এলোমেলো... বিশাল এক পৃথিবী ডাকছে তাকে... আর আমার বাড়তে থাকা মধ্যপ্রদেশ, কমে যাওয়া চুল, রিডিং গ্লাস, নিয়মিত ওষুধ সেবন - আমাকে কি ও আর দলে নেবে?

অতি দূর থেকে আমি চাতকের মতো ব্যাকুল তাকিয়ে রই বালকবেলার পানে...

ভাঙিলে হাট দলে দলে সবাই যাবে ঘরে চলে
আমি তখন মনে ভাবি, আমিও যাই ধেয়ে।
দেখি সন্ধ্যাবেলা ওপার- পানে তরণী যাও বেয়ে
দেখে মন আমার কেমন করে, ওঠে যে গান গেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।

স্মৃতির শহর - ১৫:
দুপুরবেলার গল্প

তখন কি আমি জানতাম
দুপুর এমন বাঙ্ময় হতে পারে, হতে পারে কোনো পাখির দীর্ঘ ডাক?
হ্রদের ছলছলানি? এমন সম্মোহনময়?
পুলিশের বাঁশি, মাইল মাইলব্যাপি বুটের শব্দ,
বম্বারের মৃত্যুবর্ষী গর্জন, বাতিল শাসনতন্ত্রের হাহাকার
আর পাঁচশালা পরিকল্পনার আর্তনাদ ছাপিয়ে
একটা দুপুর চাইকোভস্কির সুর হতে পারে...

(*একটি দুপুরের উপকথা;* শামসুর রাহমান)

আম্মা আমাকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছেন, এই ঘটনা বেশি বিরল নয়। দুপুরে একটা বই হাতে নিয়ে শুয়ে পড়তেন, সাথে আমি। বইটা হতে পারে "কেরি সাহেবের মুন্সি" অথবা "অনুবর্তন", যা- ই হোক না কেন, দুপুরবেলা ছাপার অক্ষরে চোখ বোলানো চাই। সেই সময় আমার দুপুরে ঘুমাতে অসহ্য লাগত, যদিও এখন ফাঁক পেলেই আমি নিদ্রাদেবীর বন্দনা করি।

আম্মা ঘুমিয়ে গেলেই আমি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসি। আমাদের বাসার পেছনে এক চিলতে একটা মাঠ আছে। বড় বহুরূপী এই মাঠ, কখনো এটা ফুটবল খেলার স্টেডিয়াম, কখনো ব্যাডমিন্টনের কোর্ট, কখনো আমার শৈশবের জাহাজ, কখনো চোর- পুলিশ

খেলা... কখনো আড্ডাস্থান... একই অঙ্গে এর এত রূপ। মাঠের পাশেই তার টানা আছে। সেই তারে রোদের উষ্ণতার আকাঙ্ক্ষায় ঝুলছে বিছানার চাদর, শার্ট- প্যান্ট, শাড়ি... তাদের শরীর থেকে আসছে জেট সাবানের সতেজ ঘ্রাণ, যা মিশে আছে এই দুপুরবেলার খাঁ খাঁ বাতাসে।

ওদের একটু পেছনেই আমাদের দেয়াল, সেই দেয়ালের ওপারে পুরো রহস্যের খাসমহল। বিশাল একটা জায়গার মাঝে ছোট্ট একটি পুরোনো বাড়ি, তার চারপাশটা কেমন জংলা আর এরই মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক সুবিশাল জাম গাছ। পড়শিদের সেই বাড়ি দেখলেই কেমন গা ছমছম করে। একটা সতেজ সবুজ কামরাঙা গাছ দাঁড়িয়ে পাঁচিলের ঠিক ওপারে, যার বেশিরভাগ শাখা- প্রশাখাই হেলে আছে আমাদের বাসার সীমানার এপারে। বিনা যত্নেই সে দেদার ফল বিলায়, মাটিতে পড়ে থাকে তার সন্তানরা অতি অবহেলাতে। এই গাছটাতে থাকে অনেকগুলো টিয়াপাখি, ওদের আহার ও বাসস্থান দুটোই দিচ্ছে এই গাছটা।

আমাদের সেই এক চিলতে জমিতে দুই একটা ঘাসফুল ফুটে আছে। এই বাসায় ফুল খুব দুর্লভ নয়, আমার বাবার লাগানো ফুল ও ফলের গাছে চারদিক শোভিত। সেই লোভে লোভে প্রতিদিন আসে বেশ কয়েকটা রঙিন প্রজাপতি। আমি তাদের পিছু নেই, ওদের চকমকে ডানাদুটো আলতো করে ধরেই যদি আবার ছেড়ে দেই, তবে হাতের আঙুলে ওদের ডানার নকশা লেগে থাকে। কী অদ্ভুত এই প্রাণীগুলো!

প্রজাপতির পিছু ছেড়ে আমি রঙ্গন ফুলের গাছ থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তার পেছনে মুখ লাগিয়ে টেনে নেই এক ফোঁটা মিষ্টি তরল, এটাই মনে হয় ফুলের মধু। মাঝে মাঝে কুড়াই সন্ধ্যামালতী ফুলের কালো রঙের বীজ। আবার কোনো কোনো দিন প্রজাপতি আর ফুল কেউই আমাকে টানে না... আমি গেট খুলে স্টেশন রোডে দাঁড়াই।

বাসার সামনেই "আশ্চর্য হাড়ভাঙার তৈল", যেকোনো ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়ার আশ্চর্য ঔষধ, আবিষ্কর্তা হেকিম হাবিবুর রহমান। হেকিম সাহেব হাড়ভাঙা রোগীর হাতে তেল মাখিয়ে দিয়ে বড় একটা হাড় নাড়িয়ে মন্ত্র পড়তে থাকেন, রোগীর প্রবল আর্তনাদে চারদিক ভেসে যায়। রোগী দেখার পাশাপাশি উনি কোক- পেপসি, চানাচুর, চকলেট আর মাঝেসাঝে ডিমও বেচেন। ওনার চিকিৎসা দেখা এবং

আড্ডার লোভে প্রচুর লোকসমাগম হতো দোকানের সামনে। আড্ডাবাজরা অধিকাংশই তেজগাঁ স্টেশনে কুলির কাজ করেন। ঠিক উলটোদিকেই যে স্টেশনের মালের বুকিং অফিস আর গোডাউন।

দুপুরবেলা আমাদের বাসাটা যতই নিস্তব্ধ, স্টেশন রোড ততটাই সরগরম। সত্যি বলতে কী, স্টেশন রোড সর্বদাই ব্যস্ত থাকে মানুষের ভিড়ে। এই এলাকায় গভীর রাতে চা "খেতে" মন চাইলেও সেটা খুবই সম্ভব। বুকিং অফিসের পাশ দিয়ে একটা সরু পথ গেছে একদম রেললাইন পর্যন্ত। রেলগাড়ির আসা- যাওয়া দেখতে চাইলে মাত্র ১০০ গজ হাঁটতে হবে। আমার বাবার শৈশবে রেলগাড়ি বড় পছন্দের ছিল, উনি চাইতেন যেন বাসা থেকেই ট্রেন দেখা যায়। উনার সেই বাসনা পূর্ণ হয়েছে, আমিও অনেক দুপুরই রেলগাড়ির যাতায়াত দেখে কাটিয়েছি।

রেলগাড়ি দেখার পর একই পথে যে বাড়ি ফিরতে হবে, সেরকম কোনো কথা নেই। প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হেঁটে স্টেশনের মূল ভবনে ঢোকা যায় অনায়াসে। আমার তেইশ বছরের তেজগাঁ জীবনে কোনোদিন কেউ টিকেট দেখতে চায় নি। রেলের ব্যবসায় যে কেন লোকসান হয় সেটা আমার খুবই বোধগম্য। লাল ইটের তৈরি স্টেশনের ভবনটা অতি প্রাচীন মনে হতো আমার কাছে। অনেক বছর পরে আমেরিকায় ভারতীয় একটা রেস্তরাঁতে ভারতের একটা ছোট শহরের স্টেশনের পুরোনো ছবি দেখে চমকে উঠেছিলাম। অনেক পুরোনো সেই অজানা স্টেশনের ছবিটি যেন আমার শৈশবের সেই স্টেশন ঘর! বৃটিশরা মনে হয় একই ডিজাইনে অনেক স্টেশন তৈরি করেছে। স্টেশনের ভেতরে রাখা যন্ত্রপাতিগুলোও স্টেশনের বয়সের কাছাকাছি, সর্বত্রই একটা মিউজিয়াম মিউজিয়াম গন্ধ।

স্টেশনে দর্শনীয় তেমন কিছুই নেই। দু'তিনটা দোকান, ভ্রাম্যমান বিক্রেতা যাদের অধিকাংশই ঢোল কোম্পানির দাদের মলম বিক্রি করছে। এই রোগ আমাদের দেশে খুবই জনপ্রিয়। স্টেশনের উলটোদিকে আরামবাগ রেস্তরাঁর তখন স্বর্ণযুগ যাচ্ছে, এই দীনহীন স্টেশনের পাশে থেকেও ওরা জমিয়ে ব্যবসা করছে। ওদের ব্যবসা এখনো বেশ জমজমাট বলেই মনে হয়েছে আমার। আমার জীবনে দেখা অন্যতম বড় খোলা ড্রেনটাও এই অঞ্চলেই, সেটার পানির কোনো কলকল ধ্বনি নেই, কেমন যেন কালো থকথকে কাদা কাদা চেহারা তার।

রেস্তরাঁ, নাপিতের দোকান আর যা কিছু জমজমাট আছে, সেগুলো পেরিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে ফার্মগেটের দিকে। যতই ঢুকবেন সেই পথে, ততই সরু ও নির্জন হয়ে পড়বে সেটা। এই রাস্তার পাশে আছে অতি প্রাচীন একটা গির্জা এবং তার সাথে পাল্লা দেওয়ার মতো পুরোনো এক কবরস্থান। দিনের বেলায় ভূতদের ঘুমানোর সময়, তাই আমি অবলীলায় হেঁটে যেতাম তার পাশ দিয়ে। কবরস্থানের গা ঘেঁষে বেখাপ্পা দাঁড়ানো কিছু শাল গাছ, স্টেশনের গমগমে পরিবেশ থেকে সাত মিনিট হাঁটলেই কেমন নৈঃশব্দের কবিতা শোনা যায়। এই গির্জাতেই মাদার টেরেসা তাঁর নির্মলা হোম অফ চ্যারিটির শাখা খোলেন কিছুদিন পর। এর পাশেই মেয়েদের বিখ্যাত স্কুল আর কলেজ হলিক্রস এবং একটু কম খ্যাতিসম্পন্ন স্কুল বটমলি হোমস। এইসব জায়গায় মিশে আছে ছেলেবেলা ছেলেবেলা গন্ধ। গির্জায় বিকেলের ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং... নাহ... বাসায় ফেরা উচিত, আম্মা নিশ্চয়ই উঠে চায়ের সরঞ্জাম করছেন।

দুপুরবেলার গল্পগুলো খুব সহজেই অতিক্রম করে স্থান ও কালের সীমানা। এরা হুট করে ৩০ বছর পাড়ি দিয়ে চলে আসে আমার কাজের মাঝে, অন্যরকম এক দুপুরে, অন্য এক শহরে। কিছুতেই বাধা মানে না তারা, এমনই নাছোড়বান্দা। যে শহরকে কতকাল আগে বিদায় দিয়েছি এক মেঘলা সকালে, সে এতদিন পরেও কেন ফিরে ফিরে আসে এই ব্যস্ত দুপুরবেলায়?

আজকের দুনিয়ার মানুষ এক দেশে জন্মে অন্য দেশে অবলীলায় চলে যাচ্ছে, বদলে ফেলছে তার নাগরিক পরিচয়। কিন্তু মানুষের নাগরিকত্বের মানবিক ব্যাপারটা আমার মনে হয় শৈশবের সাথে সম্পর্কিত। বহুদূর দেশে থেকেও মানুষ চোখ বন্ধ করলেই যে শহরটা দেখতে পায়, সেই শহর থেকে তার মুক্তি নেই। সেই হিসেবে আমি ঢাকা শহর বা আরেকটু নির্দিষ্ট করে বললে তেজগাঁর নাগরিক। দেশে থাকার সময় ঢাকার বাইরে বেড়াতে গেলেই এক ধরনের অস্থিরতায় আক্রান্ত হতাম, কবে ফিরব, কবে ফিরব... সব সময় এটাই মনে হতো। এই প্রবাসে সেটা আজ আর নেই, তবুও কোথায় যেন রয়ে গেছে একরাশ শূন্যতা। সেই শূন্যতা ঢাকায় নামলেও আর পূরণ হয় না, হবারও নয়। সেই শহর হারিয়ে গেছে আমার শৈশবের সাথে সাথে, প্রত্যাবর্তনের দিকে ওরা ফেরাবে না মুখ কস্মিনকালেও। তবু তাকে ছোঁয়া যায়, তার গন্ধ নেওয়া যায়, তার কাছে যাওয়া যায়... শুধু এই স্মৃতির শহরেই।

স্মৃতির শহর - ১৬:
বড় হওয়ার গল্প

আমার স্মৃতিরা বড় উচ্ছৃঙ্খল, দমকা হাওয়া যেন
লুকোচুরি, ভাঙাভাঙি, উলটপালটে মহাখুশি...
দুঃখেরও দুপুরে গায়, গাইতে পারে, আনন্দ- ভৈরবী।

আকাঙ্খার ডানাগুলি মিশে গেছে আকাশের অভ্রে ও আবীরে
আগুনের দিনগুলি মিশে গেছে সদ্যজাত ঘাসের সবুজে
প্রিয়তম মুখগুলি মিশে গেছে সমুদ্রের ভিতরের নীলে |
স্মৃতি বড় উচ্ছৃঙ্খল, দু'হাজার বছরেও সব মনে রাখে..."

(*স্মৃতি বড় উচ্ছৃঙ্খল;* পূর্ণেন্দু পত্রী)

আমার স্মৃতির শহরটা বড়ই সুন্দর। সেখানের বিকেলগুলো লম্বা আর নরম, মোলায়েম রোদের আলোতে স্নান করে রাস্তার পাশের বড় বড় কৃষ্ণচূড়া গাছ, তাতে বসে থাকে হলুদ রঙের কুটুম পাখি। শব্দ আছে হরেক রকমের, গাড়ির হর্ন থেকে ঝালমুড়িওয়ালার হাঁকডাক, আছে সুরের মতো রিকশার টুংটাং আওয়াজ। দূর থেকে কান পাতলে মনে হবে যেন সংগীত শুনছি। সেই শহরে হেমন্তের সকালগুলো ঘুম ঘুম কুয়াশামাখা, বসন্ত হাজির হয় সংগোপনে, গ্রীষ্মের খরতাপ যেমন আছে তেমনি আছে শ্রাবণের প্রবল ধারাতে কাকভেজা হওয়ার সুব্যবস্থা। কিন্তু স্মৃতিময় এই শহরে আছে এক বিরাট জঞ্জাল... মাঝে মাঝে ভেসে আসে সেই আবর্জনার স্মৃতিও।

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ। আমার মেজ ভাই তখন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছেন। সেদিন ছিল শেষ পরীক্ষা, কেমিস্ট্রি। সেসময় টিভিতে সকালে অনুষ্ঠান হতো কয়েক ঘণ্টা। আমরা নাদান বাচ্চাকাচ্চা, সকালের কার্টুনগুলো দেখতে সাতসকালেই উঠে পড়ি। সেদিন সকালে কার্টুন- টার্টুন দেখা হয় নি, বাসাসুদ্ধ সবাই দেখলাম আমাদের সেনাপতি সাহেবকে। এই সেনাপতিকে আগে চিনতাম না। জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পরে প্রথম টিভিতে দেখি, এরপর দেখেছি উনি সাপ্তাহিক বিচিত্রাতে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন কয়েকমাস আগে, বলেছেন সেনাবাহিনীর উচিত নয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাতে হাত দেওয়া। দেশের রাষ্ট্রপতি তখন আব্দুস সাত্তার, উনি জিয়ার ভাইস- প্রেসিডেন্ট ছিলেন। জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে নিহত হওয়ার পরে উনি প্রথমে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট এবং তারপরে নির্বাচন করে প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হন।

সাত্তার সাহেব খুব কঠিন লোক ছিলেন না। ‘‘আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রেসিডেন্ট দুষ্কৃতিকারীদের হাতে নিহত হয়েছেন’’, এই লাইনটা বলতে গিয়ে উনি হোঁচট খেয়েছিলেন বারংবার। আর সেই ‘‘দুষ্কৃতিকারীরাও’’ কেমন যেন, ক্ষমতা দখলের জন্য ক্যু করতে হয় ক্ষমতার কেন্দ্রে, সেটা না করে ক্যু করে বসল চট্টগ্রামে! নাকি ঢাকাতে কেউ ছিল যে গাছে উঠিয়ে মই সরিয়ে নিয়েছে? অনেক প্রশ্নের উত্তর আর জানা হবে না। সাত্তার সাহেব পরিস্থিতি বেশি ভালো মোকাবিলা করতে পারছিলেন না। বিএনপিতে দ্বন্দ্ব আর কলহ চরমে। মন্ত্রীর বাসা থেকে সন্ত্রাসী খুনি ধরা পড়েছে। তারপরেও দেশের মানুষ ক্ষমতার বদল চায় নি। রক্ত কম ঝরে নি স্বাধীনতার পরের দশ বছরে।

টিভিতে সেনাপতি সাহেব লম্বা একটা ফিরিস্তি দিলেন... দেশ রসাতলে যাচ্ছে, এই সময়ে দেশপ্রমিক সেনাবাহিনী কীভাবে চুপ করে থাকবে, তাই তিনি বাধ্য হয়েই রাষ্ট্রপতির অনুরোধে ক্ষমতা নিচ্ছেন। সামরিক আইন দেশে আগেও এসেছে, কিন্তু এই প্রথম আমি নিজের চোখে দেখলাম এর রন্ধন প্রণালী।

সামরিক আইনে সেনাপতি হচ্ছেন রাজা, তাকে মানুষ ডাকবে সিএমএলএ - চিফ মার্শাল ল’ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। সকালের আইন বিকেলবেলা পালটে ফেলেন, তাই বদলোকে বলে ‘‘ক্যান্সেল মাই লাস্ট অ্যানাউন্সমেন্ট’’। এর পাশাপাশি দরকার কিছু বেসামরিক মুখ, বিবেক ও মেরুদণ্ডহীন কিছু বিচারপতি আছেন এদের কুর্কমে সিল মারতে। সেই রকম এক বশংবদকে ধরে বানানো হলো প্রেসিডেন্ট। রাতের দিকে কারফিউ দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে, তবে এই রাতে কারফিউ মনে হয় আগে থেকেই ছিল। প্রকাশ্য রাজনীতি নিষিদ্ধ

করা হলো আর হ্যাঁ, সব বিশ্বসুন্দরীরা যেমন বিশ্বশান্তির জন্য কাজ করেন, তেমনি সকল সামরিক শাসকরাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদে যান। তাই অনেক রাজনৈতিক নেতা গ্রেফতার হলেন।

সামরিক আইন বড় কঠিন এটা বুঝলাম। এর বিরুদ্ধে কথা বললেই জেল, আকারে ইঙ্গিতে বললেও একই বিপদ। আকারে ইঙ্গিতে কীভাবে সামরিক আইনের বিরুদ্ধে কথা বলা যায়, সেটা আজও মাথায় ঢোকে নি। রশিদ ভাইও একই বক্তব্য দিলেন... ভাইয়া ‘‘সামরিক’ আইন চলতাছে। সাবধানে থাইকো। কথাটা ভুল নয়। আমাদের অখ্যাত আরামবাগ রেস্তরাঁ থেকেই দুইজনকে ধরে নিয়ে গিয়েছে সেনাবাহিনী, ওরা নাকি আর্মির সমালোচনা করছিল।

আমার চেনা প্রতিটা লোকই বিক্ষুব্ধ, শুধু মুখ বন্ধ। স্কুলের স্যারেরাও অখুশি, যদিও সেটা মুখে তেমন প্রকাশ করছেন না। শুধু খায়ের স্যার খুশি। উনি স্বাধীনতার আগে উর্দু পড়াতেন, এখন ধর্ম আর আরবি পড়ান। উনার মতে বাঙালির চরিত্র বুঝেছিল একমাত্র আইয়ুব খান, বেতের বাড়ি ছাড়া এই জাতি ঠিক হবে না। সেই বেতের বাড়ি এখন বাঙালির পশ্চাৎদেশে যত্রতত্র পড়াটা একদম যথার্থই মনে হয়েছে উনার কাছে। আমার বড় ভাই বামপন্থী ছাত্র রাজনীতি করতেন, বাবা- মা সরকারি চাকরি। ভাইয়া অল্প কয়দিনের জন্য গা- ঢাকাও দিলেন। দেশের প্রতিটা লোককে ক্ষেপিয়ে এই লোক কীভাবে দেশ শাসন করবে? কিন্তু দেখা গেল দেশ শাসন করতে গেলে জনপ্রিয় হতে হয় না, কালক্রমে সেনাপতির ভালো নাম হলো স্বৈরাচার, আমিও বড় হতে লাগলাম তার মিথ্যে কথা শুনতে শুনতে।

বাচ্চাদের বড় হওয়াটা বেশ দ্রুতই হয়। দেখা গেলো এই অতি অপছন্দের এবং অতি অ- জনপ্রিয় স্বৈরাচারের কাছেও হরদম বিক্রি হচ্ছে ঘাগু নেতা, টিভি উপস্থাপক, কবি, তুখোড় ছাত্রনেতা। আমাদের দুর্নীতির গোপন রোগটাও স্বৈরাচারের অজানা নয়, উনি ভাত ছড়াচ্ছেন আর কাকের অভাব হচ্ছে না। ভাত ছড়াতে ছড়াতে পুরো দেশটাই কাকময় না হয়ে যায় আবার। টিভির সংবাদে স্বৈরাচারের দিনলিপি দেখি। একদিন পত্রিকা খুলে দেখলাম স্বৈরাচারের কবিতা। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষিত হলো, সেই সঙ্গে রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল হয়ে শুক্রবার ছুটির দিন ঘোষিত হলো। এই বাটপারের হাতে দেশ, ধর্ম, রাজনীতি সবই ধর্ষিত হলো।

আমাদের স্কুলের দিনগুলোও বেশ তথ্যবহুল ছিল। একদিন শুনলাম স্বৈরাচার শালা নাকি “আটকুইড়্যা”... অর্থাৎ আঁটকুড়ে, মানে নিঃসন্তান। এরসাথে রাজনীতির সংশ্রব কী সেটা জানি না কিন্তু এই বদনাম রটার অল্প পরেই স্বৈরাচারের স্ত্রী এক সন্তানের জন্ম দিলেন। এক সপ্তাহ আগেও উনাকে টিভিতে দেখা গেছে, আসন্নপ্রসবা বলে মনে হয় নি। তবে সিএমএলএ সাহেব চাইলে একমাসেও বাচ্চা পয়দা সম্ভব। সামরিক আইন এমনই কঠিন জিনিস।

স্কুলে অনেক মজার জোক শুনি, সেগুলোর প্রতিটাই চূড়ান্ত রকমের অশ্লীল। স্বৈরাচার নাকি আবার লম্পটও, প্রায়ই নানান গুজব শোনা যায় তাকে জড়িয়ে। সে সময়ে গুজবও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ মাধ্যম ছিল। উঠতে বসতে স্কুলের বন্ধুরা গালি দেয় তাকে, বেশির ভাগ গালিই “চ” দিয়ে শুরু... আমার নিজের দেওয়া প্রথম “চ”- বর্গীয় গালিটাও স্বৈরাচারকেই দেওয়া। বালক, যুবক, নবীন এবং প্রবীণ, সবাই তাকে গালি দিয়েই যাচ্ছে, অথচ উনি ক্ষমতায় অবিচল। মিথ্যে কথা রাষ্ট্রীয়ভাবে উনি প্রতিষ্ঠা করেছেন অল্প সময়েই। একবার টিভিতে দেখলাম উনি রাতের স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে পরদিন দুপুরবেলায় মগবাজারের এক মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করছেন। মসজিদের কাছেই বন্ধুর বাড়ি, সে জানাল প্রায় এক সপ্তাহ ধরেই গোয়েন্দা আর পুলিশ মিলে ওই জায়গার নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করছে, বলা যায় না গোয়েন্দারা হয়ত স্বপ্নের খবরও আগেই পেয়ে যায়!

আমি আইয়ুববিরোধী আন্দোলন দেখি নি। কিন্তু এই মিথ্যে কথার মেরুদণ্ডহীন দেশে বড় হতে গিয়ে টের পেলাম ছাত্রদের শক্তি। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে চোখ তুলে কথা বলতে পারে শুধু ছাত্ররাই এবং প্রথম আন্দোলনের সূচনা হলো তাদের হাত দিয়েই। মজিদ খানের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধাচারণ দিয়ে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৯৮২ সালেই। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ তারিখে শহীদ হন জয়নাল, জাফর আর দীপালী সাহাসহ আরও কয়েকজন। শিক্ষাভবনের সামনে ঘটে যাওয়া সেই নারকীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন অনেকেই, আমার মা তখন ওই ভবনেই কর্মরত ছিলেন।

এ সমস্ত ঘটনার বিবরণ পত্রিকাতে বেশি আসত না, সেন্সরশিপ ছিল প্রবল। সরকার থেকে প্রেসনোট দেওয়া হতো, গুগল করে ১৪ই ফেব্রুয়ারির ঘটনার পরদিনের ইত্তেফাক রিপোর্টটা পুরো তুলে দিলাম।

গতকাল (সোমবার) সন্ধ্যায় বাংলাদেশ সরকার এক প্রেসনোটে ঢাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গের লক্ষ্যে পরিচালিত ক্রমবর্ধমান ও পরিকল্পিত ছাত্র গোলযোগ বন্ধের উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। প্রেসনোটে বলা হয়, এই ছাত্র গোলযোগ শান্তিপ্রিয় জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতেছিল। ঢাকায় ছাত্রদের একদিনের উস্কানিমূলক গোলযোগের প্রেক্ষিতে সরকার নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলী ঘোষণা করিয়াছেন:

(১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে। আজ (মঙ্গলবার) সকাল নয়টার মধ্যে ছাত্রদের সকল আবাসিক হল ত্যাগ করিতে হইবে।

(২) সভা, শোভাযাত্রা, সমাবেশ ও ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা সংক্রান্ত বিধিসমূহ কঠোরভাবে প্রয়োগ হইবে।

(৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সন্ধ্যা ৬টা হইতে ভোর ৫টা পর্যন্ত এবং মেট্রোপলিটন ঢাকার অবশিষ্ট এলাকায় রাত্রি ১০টা হইতে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকিবে।

ঘোষণায় বাংলাদেশ সচিবালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকায় গোলযোগে পর্যবসিত ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হয়। ১৪টি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনসমূহের মোর্চা তথাকথিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘোষণা কয়িয়াছিল যে, তাহারা সরকারী নীতির প্রতিবাদে সচিবালয় অবরোধ করিবে।

সকাল ১১টায় তাহার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয় এবং বক্তারা সামরিক আইন ভঙ্গ করিয়া ছাত্রদেরকে আইন নিজের হাতে তুলিয়া লওয়ার আহ্বান জানাইয়া উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দেয়। ছাত্রনেতা নামধারী এই সকল পেশাদার উস্কানিদাতাদের উস্কানিতে ছাত্ররা একটি শোভাযাত্রা বাহির করে, যা কিনা সামরিক আইনে নিষিদ্ধ। সরকারের বিরুদ্ধে ধ্বনি দিতে দিতে তাহারা একযোগে সচিবালয়ের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং পুলিশ পুরাতন হাইকোর্টের কার্জন হল সংযোগস্থলে তাহাদিগকে থামাইয়া দেয়। অতঃপর উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিরা কর্তব্যরত পুলিশের প্রতি ব্যাপকভাবে ইট নিক্ষেপ করিতে শুরু করে এবং পুলিশ কর্ডন ভাঙ্গার চেষ্টা করে।

সংখ্যাগত কারণে কোণঠাসা হইয়া শুধুমাত্র লাঠি ও বেতের ঢাল সজ্জিত পুলিশ বিপদগ্রস্ত হয় এবং জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য হোসপাইপের সাহায্যে পানি নিক্ষেপ করে। উহা ব্যর্থ হইলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

এই নিউজ পড়ে ও দেখে যে বড় হয়েছে, মিডিয়া সম্বন্ধে তার উচ্চ ধারণা থাকবে না। আমি ও আমার সমসাময়িক অনেকের মনেই মিডিয়ার ব্যাপারে চিরস্থায়ী অবিশ্বাস জন্মে গেছে।

স্বৈরাচারের শাসনকালেই আমি স্কুল থেকে কলেজে ভর্তি হই। আমাদের স্কুলের প্রায় সব ছাত্রই রাস্তার ওপারের ঢাকা কলেজে পড়ার স্বপ্ন দেখে, আমিও তার ব্যতিক্রম নই। আমাদের স্কুলের বিরাট একটা দল ঢাকা কলেজে ঢোকে। ঢাকা কলেজ রাজনৈতিকভাবে খুবই সচেতন একটা জায়গা। ছাত্রলীগের এক নেতা আমাদের স্কুলসূত্রে বড় ভাই। উনি আমাদের প্রায় সবাইকে ঢুকিয়ে দিলেন ছাত্রলীগে। প্রথম দুই মাস সকালে একটা- দুইটা মিছিল, এইটুকুতেই আমার রাজনৈতিক জীবনের শুরু ও শেষ। আমার ভূমিকা ছিল দর্শকের, আর মন দিয়ে পত্রিকার খবর পড়া।

সে সময় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুটো দলই স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন করে যাচ্ছে। দুজনে একসঙ্গে ঠেলা দিলে স্বৈরাচারকে সদর দরজা দেখানো যাবে, এই বিশ্বাসটা প্রবল ছিল। আমি তখনো এবং এখনো বিশ্বাস করি সেটা। ১৯৮৬ সালের প্রহসনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নাম লিখিয়ে স্বৈরাচারকে আরও দীর্ঘায়িত করল, এর পরপর আমাদের কলেজে ছাত্রলীগ আর ছাত্রদল প্রায় মুখোমুখি অবস্থানে চলে আসে। দুদিন আগেও ছাত্রলীগের মিছিল থেকে আন্দোলনের হুংকার শোনা যেত, আর এখন সেখানে নির্বাচনমুখী কথাবার্তা। ওদিকে ছাত্রদল বলছে, নির্বাচনে যাওয়া জাতীয় বেঈমানি। ওদের নেত্রী স্বৈরাচার প্রশ্নে আপোশহীন। লীগের ছাত্রনেতারা বলছেন... আওয়ামী লীগ ইয়াহিয়ার আমলেও নির্বাচন করেছে, সুতরাং... জানি না এই বুদ্ধি কে দিয়েছিল জননেত্রীকে, কিন্তু এই ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে আওয়ামী লীগকে এবং পুরো জাতিকে।

স্বৈরাচারবিরোধী সবচেয়ে বড় আন্দোলনটা হয়েছিল ১৯৮৭ সালে। দুই বড় দলের যুগপৎ আন্দোলনের এক পর্যায়ে শহীদ হন নূর হোসেন। লুৎফর রহমান রিটন ভাইয়ের এই লেখাটা পড়ে সেসব কথা মনে পড়ছিল। সেবারও স্বৈরাচার পতনের একদম কাছে গিয়েও আমরা শেষ হাসি হাসতে পারি নি।

সেই হাসি হাসতে আরও তিন বছর লেগেছে। আমি এরই মধ্যে কলেজ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। ততদিনে অবিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে, আন্দোলন করলেই স্বৈরাচার হটে যাবে এই বিশ্বাসও কেমন যেন টলে গেছে। ১৯৯০ সালের অক্টোবর মাসে

সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচির মাধ্যমে আন্দোলন শুরু হলো। কিন্তু এবার সেটা বেগবান হতেই থাকল, নভেম্বর নাগাদ আমরা আবারো আশার আলো দেখতে পেলাম।

আমি তখন বুয়েটের প্রথম বর্ষের মাঝামাঝি। ফিরে দেখলে মনে হয় এই সময়টা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। আমি সক্রিয় রাজনীতি থেকে বহুদূরে কিন্তু অসচেতন নই। স্বৈরাচার এবার ভাড়া করেছে অভি আর নীরুর মতো বৃহৎ মাপের ছাত্রনেতা। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য আর সাধারণ ছাত্রদের মুখে তারা ক্যাম্পাস থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে যেন আমি ইতিহাসই দেখতাম সেই সময়ে।

এর মধ্যেই এসে গেল ২৭ নভেম্বর। সেদিন সকালে একটা পরীক্ষা ছিল। আমি আর আমার বড় ভাই সকালে ফার্মগেট থেকে বুয়েটের সবেধন নীলমণি বাসটা ধরলাম। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢোকার অনেকগুলো পথই বন্ধ। বাস বেশ ঘুরপথেই ক্যাম্পাসে ঢুকল। সকাল আটটার পরীক্ষাটাও হলো। এরপরই ক্লাস বর্জন। সকাল ১০টা নাগাদ আমাদের ক্যাম্পাস থেকে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিলটা বেরিয়ে গেল। এর পরপরই গুলির শব্দ শুরু হলো। চারধার প্রকম্পিত করার মতো শব্দ। গুজব শুনলাম আমাদের বুয়েটের মিছিলটা আক্রান্ত হয়েছে! স্বৈরাচারের অস্ত্র তখন অভি আর নীরুর গুন্ডাবাহিনী। জানা গেল রাজু নামে এক বুয়েট ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়েছে। রাজু ভাইকে আমি মুখে চিনতাম।

একটু পরেই গোটা শহর কুরুক্ষেত্রে পরিণত হলো। বুয়েট থেকে প্রায় পুরোটা পথই হেঁটে আর দৌড়ে বাসায় ফিরতে হলো। আর একটু পরেই শুরু হলো অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ। এর ভেতরই বিচ্ছিন্ন গুলির শব্দ, আমি ১৯৭১ দেখি নি কিন্তু ১৯৯০- তে দেখলাম মানুষের সেই একই ঐক্য। বিকেলে এক ডাক্তার বড় বোন জানালেন অভি- নীরু গ্রুপের গুলিতে ড: মিলন নামে একজন ডাক্তারের শহীদ হওয়ার কথা। ড: মিলনকে আমরা কেউ চিনতাম না, কিন্তু মুহূর্তেই যেন উনি সাধারণ থেকে অসাধারণত্বে উন্নীত হলেন। এই মিথ্যে বলার কাপুরুষ দেশ যেন অপেক্ষা করছিল এক সাহসী পুরুষের, যে নিজেকে বিলিয়ে সবার জন্য আগুন নিয়ে আসবে। এরপরের ঘটনা সবারই জানা।

স্বৈরাচার পতনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সপ্তাহব্যাপী বিজয়- উৎসব চলে। আমরা প্রতিদিন সকালে যেতাম সেই অনুষ্ঠানে, সারাদিন থাকতাম, কনসার্ট দেখে, হৈচৈ করে আর রঙ মেখে সন্ধ্যায় ফিরতাম। বোকার মতো ভেবেছিলাম যে দেশের যাবতীয় সমস্যার সমাধান এবার হয়ে যাবে, যেই বাংলাদেশ আমরা সবাই স্বপ্নে দেখি সেই বাংলাদেশ এবার ধরা দেবে।

স্মৃতির শহর আমার শৈশবের গল্প। শৈশবের শেষ কোথায় এটা বলা মুশকিল কিন্তু আমি জানি যে শৈশবটা স্বপ্ন দেখার সময় আর সেই স্বপ্নের পরাজয়টা বড়বেলার গল্প। শৈশবের তুলনায় তাই বড়বেলার গল্পগুলো বড়ই ধূসর। আমিও এরপর স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়েই বড় হয়ে গেলাম। সেই গল্পগুলোও অন্য একসময়ে করব।

আমাকে যেসব জিনিস স্পর্শ করেছে ব্যাপকভাবে, আমার পরিবার, আমার পিতামাতা, শৈশবে বন্ধুরা, আমার বইপড়া, অতি প্রিয় কবি, ইশকুল, ঘুম ঘুম তেজগাঁ... সবাইকে নিয়েই আমি পর্ব লিখেছি একটি করে। আরও কিছু বিষয়ে লিখতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু কিছু গল্প অপ্রকাশিত থাকাই হয়ত ভালো।

জীবন নিয়ে যদি আমার অভিমত জানতে চাওয়া হয়, তবে আমি বলব জীবন অত্যন্ত বিস্ময়কর এক যাত্রা, যতই এর ভেতর দিয়ে যাচ্ছি সেই বিস্ময় যেন শুধু রঙ পালটাচ্ছে এবং আরও নতুন রূপে আসছে আমার কাছে। তবুও এই মাঝবয়েসের কাছে এসেও যেন বালকবেলার বিস্ময় রয়ে গেছে অমলিন অথবা হয়ত এখনো আমি শৈশবকে অতিক্রম করতে পারি নি। এতদিনেও যদি না পারি, তবে বাকি জীবনেও যে এর থেকে মুক্তি নেই, সেটাও সুনিশ্চিত। তবে শৈশব কৈশোরের স্মৃতি আছে বলেই জীবনযাপন বাস্তবতার কষাঘাত থেকে একটু সুরক্ষা পায়।

স্মৃতির শহর হুট করে লিখতে বসলেও এই গল্পগুলো আমার মাথার ভেতরে ছিল অনেকদিন। সচলায়তন আর অভ্রের কল্যাণে সেই গল্পগুলো আপনাদের শোনাতে পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। সবার কপালে এই সৌভাগ্য জোটে না। এই সিরিজ পড়ে কেউ কেউ স্মৃতিভারাক্রান্ত হয়ে নিজের শৈশব নিয়ে লিখেছেন, এটা আমার পরম পাওয়া। একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের সবচেয়ে বেশি মিল মনে হয় থাকে শৈশবেই, এরপর পথগুলো সব নানান দিকে যেতে থাকে। তাই হয়ত শৈশবই আমাদের সম্মিলিত

ঐক্যের স্থান। কাউকে শৈশব- অভিমুখে যাত্রা করতে দেখলে আমরাও হয়ত আনমনে হৃদয় খুঁড়ে তুলে আনি এক টুকরো স্মৃতির শহর। আমরা শৈশব ছেড়ে গেলেও শৈশব আমাদের ছাড়ে না!

বেঁচে থাকুক - আমাদের সবার স্মৃতির শহর।